৬৩-৬৪ দুই খণ্ড একত্রে

বাংলাপিডিএফ

বিদেশী ঘাটির সন্ধানে

রোমেনা আফাজ

জংগল বাড়ি ঘাটি

রুনি

দস্যু বনহুর সিরিজ

দুই খণ্ড একত্রে

বিদেশী ঘাটির সন্ধানে-৬৩
জঙ্গল বাড়ি ঘাটি-৬৪

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

ডাঃ রায় আপনিই যে হত্যাযজ্ঞের নায়ক এ কথা কেউ ভাবতেও পারেনি। কথাটা গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হারুন যেন বোবা বনে গেছে। সে ডাঃ রায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো এবং বিশ্বাস করতো। আজ সেই বিশ্বাসী প্রধান ব্যক্তিটাকে লোমশ আলখেল্লা পরা অবস্থায় খুনির যন্ত্রপাতি হাতে দেখে সে যেন একেবারে থ'মেরে গেছে।

ডাঃ রায় এর মুখখানা পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে। এমন পরাজয় আসবে তার জীবনে তিনি ভাবতেও পারেননি। ডাঃ রায় রাগে দুঃখে অধর দংশন করছেন। এই শীতের রাতেও তাঁর সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠছে।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তারা সবাই বিস্মিত হতবাক হয়ে গেছেন। কেউ ভাবতে পারেননি যে ডাঃ রায় এই হত্যাকান্ডের অধিশ্বর। তাঁর হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। তাঁর লোমশ আলখেল্লাটা খসে পড়ে আছে পায়ের কাছে।

মিঃ ফেরদৌস উঁবু হয়ে আলখেল্লার ভিতর থেকে দুটো অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র বের করে নিলো। যন্ত্র দুটি হাতে নিয়ে সে সোজা-হয়ে দাঁড়ালো তারপর বলতে শুরু করলো—আপনারা হয়তো কিছুটা অনুমান করেছেন এই দুটি যন্ত্র দ্বারা খুনী তার কার্যোদ্ধার করতো। এই যে আমার বাম হাতে যে যন্ত্র বা অস্ত্রটি দেখছেন এটা দিয়ে মানুষকে হত্যা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিকারের দেহ থেকে এই যন্ত্র দ্বারা রক্ত শোষণ করে নেওয়া হয়। এ যন্ত্রের কাজ এতো দ্রুত যে কয়েক মিনিটেই শিকারের দেহ থেকে সমস্ত রক্ত এই যন্ত্রের মধ্যে চলে আসে। আর আমার ডান হাতে যে যন্ত্রটি দেখছেন আপনারা সেটি হলো শিকারের মাথা থেকে অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার চোখ দুটি তুলে নেওয়া হয়। এই যন্ত্রের কাজ অতি সূক্ষ্ম, যে চোখ দুটি শিকারের মাথা থেকে তুলে নেওয়া হয় তার কোন শিরা-উপশিরা বিনষ্ট হয় না। এই চোখ এবং এই রক্ত এই দুটি যন্ত্রের মধ্যেই সজীব থাকে। হাঁ, তারপর ঐ যে টেবিলে যে অদ্ভুত ধরনের বাক্স দেখছেন ঐ বাক্সে এই চোখ ও রক্ত জমা রাখা হয়। এ বাক্সগুলির নাম আই ব্যাঙ্ক আর ব্লাড ব্যাঙ্ক। এই সব বাক্সে দু'মাস পর্যন্ত রক্ত আর চোখগুলো তাজা থাকে।

মিঃ ইলিয়াস বলে উঠলেন—আশ্চর্য!

হাঁ আশ্চর্যই বটে।

মিঃ জাফরী পূর্বের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কিন্তু আপনি কি করে এই হত্যা রহস্যের মূল স্তম্ভের সন্ধান পেলেন মিঃ ফেরদৌস?

হাঁ, সে কথাই এখন বলবো, আপনারা যখন ডক্টর হিন্ময়কে সন্দেহ করে তার পিছনে ধাওয়া করেছেন তার বহু পূর্ব হতেই আমি ডাঃ রায়কে সন্দেহ করে এসেছি এবং তখন থেকেই তাকে আমি ফলো করে আসছি।

ডাঃ রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছেন মিঃ ফেরদৌস-এর দিকে। দু'চোখে তার যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

মিঃ ফেরদৌস ঠিক্ ডাঃ রায় এর পাশে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছিলো, আবার বলতে শুরু করলো সে—মিঃ জাফরী, আপনার হয়তো মনে আছে এক গভীর রাতে আপনি ডাঃ রায়-এর ল্যাবরেটরিতে গিয়েছিলেন কোন প্রয়োজনে। তার ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে আপনি যা দেখলেন তা অতি বিস্ময়কর। কারণ ডাঃ রায় তখন একটি অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে মোকাবেলা করছিলেন। আপনি দেখলেন লোমশদেহি আলখেল্লা পরিহিত এক ব্যক্তি এবং আপনি মনোযোগ সহকারে শুনলেন তার কথা-বার্তা। ডাঃ রায়কে আপনি কোনোদিন সন্দেহ করেননি বা করতে পারেননি। সেদিন আপনি আরও নিশ্চিন্ত হলেন ডাঃ রায় সম্বন্ধে।

হাঁ, আমি ঠিক্ ঐ প্রশ্নই আপনাকে করতে যাচ্ছিলাম মিঃ ফেরদৌস। কারণ ঐ রাতে আমি ডাঃ রায়-এর ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে যা দেখেছিলাম এবং শুনেছিলাম তা থেকে বোঝা যায় ডাঃ রায় ছাড়াও আরও এক ব্যক্তি আছে যে লোমশ দেহি মানুষ। কথাগুলো বলে থামলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ ফেরদৌস বললো—যে লোমশদেহি আলখেল্লা পরিহিত ব্যক্তিকে আপনি সেদিন ডাঃ রায়-এর ল্যাবরেটরিতে দেখেছেন সে লোমশদেহি অন্য কেহ নয় আমি.....

কক্ষ মধ্যে যেন বাজ পড়লো, সকলেই বিস্ময় নিয়ে তাকালেন মিঃ ফেরদৌসের মুখে।

এমনকি ডাঃ রায় পর্যন্ত চমকে উঠলেন অকস্মাৎ চাবুক খাওয়া আহত ব্যক্তির মত। আঁতকে উঠে তাকালেন, তার দৃষ্টিতে ঝরে পড়লো একরাশ প্রশ্ন। কিন্তু তিনি কোন কথা বললেন না।

মিঃ ফেরদৌস বলেই চললো—আমি জানতে পারি ডাঃ রায় এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে চলেছেন কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে সত্য কিনা জানার জন্যই আমি নিজে তারই ছদ্মবেশে তারই ল্যাবরেটরিতে যাই। তার মুখের ভাবেই আমি বুঝতে পারি তিনি এই হত্যাযজ্ঞের নায়ক কিনা। কারণ ডাঃ রায় তাঁর নিজস্ব অদ্ভুত ড্রেসে অপর এক ব্যক্তিকে দেখে শুধু ঘাবড়েই যাননি, একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। ঐ মুহূর্তে যদি মিঃ জাফরী গিয়ে

না পৌঁছতেন তাহলে আমি ঐ দিনই তাঁর কাছ থেকে তার হত্যা রহস্যের মূল মন্ত্র আবিষ্কার করে নিতাম। যাক তবু আমি সে দিন যতটুকু জানতে পেরেছিলাম সেইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো।

থামলো মিঃ ফেরদৌস, মুখমণ্ডল তার দীপ্ত উজ্জ্বল। আবার বলতে শুরু করলো সে—কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও ডাঃ রায়-এর মনে সেদিনের ব্যাপার ভীষণভাবে রেখাপাত করলো। তিনি সর্বক্ষণ এ ব্যাপার নিয়ে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর হত্যা লীলা সমানভাবে চললো। ডক্টর হিন্নুয়কে পুলিশ মহল যাতে সন্দেহ করে সে জন্য ডাঃ রায়-এর প্রচেষ্টা কম ছিলোনা। ফেরদৌস সবার মুখে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—আপনারাও তাকেই সন্দেহ করছিলেন অবশ্য আমি নিজেও এ ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে একমত হয়ে গিয়েছিলাম।

মিঃ জাফরী এবং তার দল-বল বিস্ময় নিয়ে শুনে যাচ্ছিলেন। বলে উঠেন পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ আলী—আপনি কি করে এখানে এলেন এবং ডাঃ রায়-এর এই গোপন ল্যাবরেটরিতে সন্ধান পেলেন জানতে চাই মিঃ ফেরদৌস?

একটু হেসে বললো মিঃ ফেরদৌস—আমি জানতাম প্রতি রাতে ডাঃ রায় তাঁর হত্যা সাধনা চালিয়েই চলেছেন। এ কারণে প্রতি রাতে তার একটি করে শিকারের প্রয়োজন। আমি এই সুযোগ নিলাম। ডাঃ রায় আমাকে একদিন গভীর রাতে তার গোপন ল্যাবরেটরিতে আসার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন—সেই লোমশদেহিকে যদি আপনি স্বচক্ষে দেখতে চান তবে ঐ স্থানে আসবেন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করবো..... এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কেনো এখানে এসেছিলাম এবং এখানে পৌঁছেই আমি মিঃ জাফরীর কাছে ফোন করেছিলাম।

মিঃ জাফরী এবার বললেন—হ্যাঁ, আপনি আমাকে সেই রকম জানিয়ে ছিলেন। মিঃ ফেরদৌস, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ডাঃ রায় যে এই হত্যাকান্ডের নায়ক আমরা এতোদিন তাঁর সঙ্গে একত্রে কাটিয়েও বুঝতে পারিনি। আপনি সুকৌশলে তা বুঝে নিয়েছিলেন এবং তাকে কৌশলে বন্দী করতে সক্ষম হলেন কিন্তু আর একটি প্রশ্ন করবো?

করুন। হাঁ, আপনার প্রশ্নটা কি হবে অবশ্য আমি জানি তার পূর্বে আরও একটি কথা আপনাদের জানা দরকার।

সবাই স্থির নয়নে তাকালেন মিঃ ফেরদৌসের মুখের দিকে।

মিঃ ফেরদৌস বলে চলে—আপনাদের স্মরণ আছে বিখ্যাত গোয়েন্দা শঙ্কর রাও আজ দু'সপ্তাহ হলো নিখোঁজ আছেন।

মিঃ হারুন বলে উঠেন—হাঁ, তিনি কি সত্যিই নিহত হয়েছেন।

না, তিনি নিহত হননি! বললো ফেরদৌস।

এক সঙ্গে প্রায় সবাই বলে উঠেন—মিঃ শঙ্কর রাও জীবিত আছেন।

হাঁ।

মিঃ ইলিয়াস বললেন—ডাঃ রায় তাকে আজও জীবিত রেখেছেন?

ডাঃ রায় নয় মিঃ শঙ্কর রাওকে আমিই সরিয়ে রেখেছি.....

মিঃ ফেরদৌসের কথায় মিঃ জাফরী বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন—আপনিই মিঃ শঙ্কর রাওকে—

হাঁ, আমিই তাকে সরিয়ে রেখেছি, কারণ শঙ্কর রাও আমার কাজে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাই বাধ্য হয়ে তাকে আটক রেখেছি।

তিনি জীবিত সুস্থ আছেন তাহলে? বললো মিঃ হারুন।

তিনি জীবিত এবং সুস্থ আছেন। কালকেই তিনি আপনাদের মধ্যে ফিরে আসবেন। ডাঃ রায়, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন কারণ আমি আপনার কাজে আপনার সাধনায় বাধা দিলাম। মিঃ জাফরী এবং আমার অন্যান্য বন্ধুগণ, আপনাদের সঙ্গেও আমাকে অনেক সময় অনেক রকম ছলনা করতে হয়েছে সেজন্য আমি লজ্জিত—দুঃখিত—মিঃ ফেরদৌস-এর কথা শেষ হয় না।

মিঃ জাফরী তার পাশে এসে দাঁড়ায় তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—আজ কান্দাই হত্যা রহস্যই শুধু সমাধান হলোনা মিঃ ফেরদৌস, তার সঙ্গে সঙ্গে দস্যু বনহুরকেও আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলাম....কথা শেষ করেই মিঃ জাফরী তাঁর রিভলভার মিঃ ফেরদৌসের বুকে চেপে ধরলেন এবং তাঁর সহকারীদের লক্ষ্য করে ঈংগিৎ করলেন। তাদের অস্ত্র নিয়ে মিঃ ফেরদৌসকে ঘিরে ফেলার জন্য।

তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করলো মিঃ জাফরীর সঙ্গীগণ, নিজ নিজ অস্ত্র বাগিয়ে ফেরদৌসকে ঘিরে দাঁড়ালো তারা।

মিঃ ফেরদৌসের মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হলোনা।

কক্ষ মধ্যে সকলেরই চোখে মুখে রাশিকৃত বিস্ময় ছড়িয়ে পড়েছে। মিঃ ফেরদৌস স্বয়ং দস্যু বনহুর এ যেন তারা ভাবতেই পারছেন না।

এমন কি ডাঃ রায়-এর চোখেও বিস্ময় ঝরে পড়ছে। তিনি মিঃ ফেরদৌসকে এতোদিন একজন সাধারণ গোয়েন্দা বলেই জানতেন, আজ তার বন্দী অবস্থায় একি শুনলেন। স্বয়ং দস্যু বনহুর তাকে এমনভাবে পরাজিত করলো।

মিঃ ফেরদৌসকে যখন মিঃ জাফরী ও তার দল অস্ত্র নিয়ে ঘিরে ফেলেছে তখন মিঃ ফেরদৌস হঠাৎ হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—আমি ঠিক জানতাম আপনি আমায় চিনতে পেরেছেন কারণ

কান্দাই শহরে একমাত্র আপনার চোখকেই আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। আরও জানতাম হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটন হবার পর পরই আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে ইচ্ছুক হবেন। কিন্তু দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ মনে করেছেন তত সহজ নয়.....

কথা শেষ না করেই মিঃ ফেরদৌস বেশী দস্যু বনহুর একটি বোম জাতীয় বল মাটিতে নিক্ষেপ করে, সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত কক্ষটার মধ্যে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে মিঃ জাফরী তার রিভলভার থেকে গুলি ছোড়ে এবং সবাইকে গুলি ছোড়ার জন্য আদেশ দেন কিন্তু আশ্চর্য কোন রিভলভার থেকে গুলি বের হয় না।

অজস্র ধোঁয়ার মধ্যে শোনা যায় বনহুরের হাসির শব্দ—হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ।

জমাট ধূম্র রাশির মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়লেন কয়েকজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার।

অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধূম্ররাশি কমে এলো। কক্ষমধ্যে সবকিছু স্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মিঃ জাফরী এবং তার দলবল চোখ রগড়ে তাকালেন, দেখলেন ডাঃ রায় দাঁড়িয়ে আছেন, মিঃ ফেরদৌস কক্ষমধ্যে নাই।

প্রত্যেকটি পুলিশ অফিসারের মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করলো। তারা দস্যু বনহুরকে হাতে পেয়েও পাকড়াও করতে সক্ষম হলেন না এটা তাদের চরম পরাজয়।

মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো। তিনি রাগে ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগলেন। শুধু ক্রুদ্ধই হলেন না তিনি একেবারে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাদের আগ্নেয় অস্ত্রগুলিও আজ সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়লো কি করে। দস্যু বনহুর যখন অট্টহাসিতে ভেংগে পড়লো তখন মিঃ জাফরী স্বয়ং গুলি ছুড়েছিলেন এবং তার সঙ্গীরাও গুলি ছুড়েছেন কিন্তু একটি গুলিও তাঁদের রিভলভার থেকে বের হয়নি।

ধুম্ররাশি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসারগণ নিজ নিজ আগ্নেয় অস্ত্র খুলে ফেলে দেখলেন, তাদের অস্ত্রে কোন গুলি ভরা ছিল না। বিস্ময়ে হতবাক হলেন মিঃ জাফরী ও তাঁর দলবল কারণ তারা তাঁদের রিভলভারে গুলি ভরেই রেখেছিলেন। ঐ মুহূর্তে তাদের রিভলভার কি করে গুলি শূন্য হলো ভেবে পেলেন না।

যেন সব যাদু বিদ্যার মত মনে হলো তাঁদের কাছে। কিন্তু ভেবে আর কি হবে মিঃ জাফরী এবার ডাঃ রায়কে বন্দী অবস্থায় গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে কান্দাই পুলিশ অফিসে এলেন।

সমস্ত শহরে কান্দাই হত্যা রহস্যের অবসান ব্যাপার নিয়ে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়লো। সংবাদ পত্র গুলিতে এই হত্যা রহস্যের অবসান নিয়ে গত রাতের ঘটনাটি বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পেলো।

ডাঃ রায় যে এই হত্যা রহস্যের নায়ক একথা যখন কান্দাই বাসীদের ঘরে ঘরে পৌঁছলো তখন সবাই ছুটলো এই অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ ডাক্তারটিকে একবার স্বচক্ষে দেখার জন্য।

পুলিশ অফিসে অগণিত গাড়ির ভীড় জমে গেলো। হাজত কক্ষে লৌহ শিকলে হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মহামান্য ডাঃ রায় দু'হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছেন। কান্দাই বাসীগণ বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। হাজত কক্ষের একপাশে ডাঃ রায়-এর সেই অদ্ভুত লোমশ পোশাকটি পড়ে আছে, আরও আছে সেই বিস্ময়কর অস্ত্র দু'টি। যে অস্ত্র দুটি দ্বারা ডাঃ রায় তার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ছিলেন।

প্রত্যেকটা মানুষের মনে একরাশ কৌতুহল। যেমন তারা অবাক হয়েছে তেমনি হয়েছে আশ্বস্ত। আর তাদের জীবন নিয়ে আতঙ্কে কাল কাটাতে হবেনা। মৃত্যুর হীম স্পর্শ আর কাউকে স্পর্শ করবে না।

কান্দাই শহরের বুকে একটা অনাবিল আনন্দ স্রোত বয়ে চলেছে। এখানে সেখানে সব জায়গায় শুধু ঐ এক কথা, রহস্যময় হত্যাকান্ডের সমাধান হয়েছে। খুনী ডাঃ রায় তার গবেষণাগারে লোমশ দেহির পোশাকসহ গ্রেপ্তার হয়েছে। স্বয়ং দস্যু বনহুর এই হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে।

❑

নূরী বনহুরের চুলে আংগুল বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—সত্যি তুমি আশ্চর্য মানুষ।

আজ বুঝি নতুন করে আবিষ্কার করলে? মৃদু হেসে বললো বনহুর।

নূরী বললো আবার—কি করে তুমি যে অসম্ভবকে সম্ভব করো বুঝতে পারি না। যে হত্যার রহস্য নিয়ে জাঁদরেল পুলিশ অফিসারগণ হাঁপিয়ে পড়েছিলো তুমি তাকে কেমন নিখুঁতভাবে উদঘাটন করলে। শুধু তাই নয় হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছো।

হাঁ, আমার এ সফলতার জন্য পুলিশ মহলের সহায়তা আমার কাম্য ছিলো। এজন্য আমি পুলিশ মহলকে ধন্যবাদ জানাই।

আচ্ছা হুর, তুমি পুলিশের চোখে ধোঁয়া দিয়ে নিজে সরে পড়লে কিন্তু পুলিশের অস্ত্রগুলি কি করে অকেজো হলো বললে না তো?

বনহুর একটু হেসে বললো—বলেছি তো সবই কৌশলে করেছি।

তবু বলোনা শুনি?

পুলিশ অফিসারগণ যখন তাদের অস্ত্রগুলি হাওয়ালদার গোমেশ চাঁদের কাছে দিয়েছিলেন সেগুলো ঠিক্‌মত কাজ করবে কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তখন গোমেশের কাজটা আমিই করি। গোমেশকে তখন অন্য কাজে পাঠিয়ে দিই। এবার বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই।

হাঁ-এ জন্যই তো বলি তুমি আশ্চর্য মানুষ।

মোটেই না।

ধরো তোমার কৌশল যদি ফাঁস হয়ে যেতো তখন কি করতে?

তখন অন্য উপায় অবলম্বন করতাম।

হুর!

বলো?

তুমি যে বলেছিলে এই হত্যা রহস্যের শেষ এখনও হয় নি!

হাঁ-নূরী, এ হত্যা রহস্য এখনও সম্পূর্ণ উদঘাটন হয়নি। কারণ হত্যাকারী গ্রেপ্তার হয়েছে কিন্তু হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে কোন দেশ। এখন আমার কাজ সেই দেশ খুঁজে বের করা—কোন দেশ ডাঃ রায়কে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলো।

বনহুরের কথায় মুহূর্তে নূরীর মুখখানা বিমর্ষ হলো, বললো—আবার তুমি এই হত্যা রহস্যের পিছনে আত্মনিয়োগ করবে?

হাঁ, যতক্ষণ না সেই বিদেশী ঘাটি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছি ততক্ষণ আমি শান্তি পাবোনা। আমি জানতে চাই অগণিত নীরিহ মানুষকে হত্যা করে তাদের অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট করে এতো রক্ত আর এতো চোখ কোথায় যায়। শুধু ডাঃ রায়ই নয় এমন বহু ছদ্মবেশী নরহত্যাকারী এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে তাদের কাজ চালিয়ে চলেছে যা সভ্য সমাজের অনেকেই জানেন না। নূরী, আমি এই বিদেশী ঘাটিগুলোকে খুঁজে বের করবো এবং তাদের শায়েস্তা করবো! বনহুরের সুন্দর মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠলো।

নূরী তখনও স্বামীর চুলে আংগুল চালিয়ে চলেছে। এবার হাতখানা তার আপনা-আপনি থেমে যায়, বলে—ডাঃ রায়কে পুলিশের হাতে না দিয়ে তুমি তাকে আটক রেখে সব কিছু কথা জেনে নিতে পারতে, মারে তার কাছ

থেকে এই হত্যা রহস্যের মূল কারণ জেনে নিয়ে তাদের আসল ঘাটির সন্ধান জানতে পারতে।

নূরীর কথায় হাসে বনহুর—ডাঃ রায় কাঁচা মানুষ বা কচি ছেলে নয়। প্রাণ গেলেও তিনি এসব কথার একটিও ফাঁস করবেন না জানতাম। কাজেই তাকে হত্যা না করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি কারণ কান্দাই বাসীগণ এ হত্যারহস্য নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্নতার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলো। ডাঃ রায় যে এই হত্যাকান্ডের মূল নায়ক এটাই তাদের কাছে উদঘাটন হয় এটাই আমি চাই। নূরী আবার আমাকে কান্দাই ছেড়ে যেতে হচ্ছে এজন্য আমি দুঃখিত।

নূরী অভিমান ভরা গলায় বললো—দস্যু বনহুর কবে দুঃখ পেলো আর না পেলো আমি জানতে চাই না। আর কবেইবা সে কান্দাই স্থির হয়ে বসে রইলো তাও আমার জানার প্রয়োজন নাই।

বনহুর উঠে বসে ওর চিবুকটা তুলে ধরে বললো—রাগ করছো নূরী? তুমি তো জানো বিনা কারণে আমি কোনদিন বাইরে যাই না।

জানি কারণ তোমার কোনদিন শেষ হবে না। কোনদিন তুমি.....

নূরী তুমি কি চাও আমি অকেজো হয়ে বসে থাকি? তুমি কি চাও আমি পঙ্গু হয়ে যাই?

না, আমি তা চাই না।

তবে কেনো তুমি আমার কাজে মাঝে মাঝে বাধা দাও—বলো তো?

এবার নূরী বনহুরের গলাটা বেষ্টন করে ধরে বলে—হুর তুমি কি জানোনা, তুমি না থাকলে তোমার আস্তানা কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। তুমি কি জানোনা তোমার অনুচরেরা কেমন নিস্প্রাণ হয়ে যায়। তোমার তাজ খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়।

সব জানি নূরী সব আমি জানি, কিন্তু পারি না কাজ রেখে চুপ চাপ বসে থাকতে। তা ছাড়া তুমি তো জানো এই হত্যার রহস্য কতবড় সাংঘাতিক। এই হত্যা রহস্যের উৎপত্তি কোথায় আমি তাই জানতে চাই। জানো নূরী শুধু কান্দাই নয় সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই হত্যার রহস্য সংঘটিত হয়ে চলেছে। নানা দেশে নানা ভাবে এরা কাজ করছে। প্রতিদিন এরা কত অমূল্য জীবন বিনষ্ট করছে তার হিসাব কেউ রাখে না। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশেও এদের গোপন হত্যালীলা চলেছে।

নূরী বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো—বাংলাদেশেও এই হত্যালীলা চলেছে?

হাঁ, বিদেশীরা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মিশে তারা বাংলার যুবক এবং শিশুদের রক্ত শুষে নিচ্ছে। নূরী, বলো এসব জেনে শুনেও কি আমি নিশ্চুপ বসে থাকতে পারি?

না তা পারো না।

হাঁ, সেই কারণেই আমি আবার এই নতুন অভিযানে আত্মনিয়োগ করবো।

বনহুর তার স্বর্ণ-খচিত সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলো।

সবে মাত্র সিগারেটে বনহুরের ঠোঁট দু'খানা স্পর্শ করেছে অমনি তার পাশের ওয়্যারলেস কক্ষের সংকেতপূর্ণ ঘন্টা বেজে উঠলো।

বনহুর সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে রহমান এবং বনহুরের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ছুটে এসেছে।

বনহুর ওয়্যারলেস কক্ষে প্রবেশ করে সাউন্ড বক্সের সম্মুখে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে একটা নীলাভো আলো জ্বলে উঠলো এবং একটি গুরুগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো, সম্পূর্ণ অজ্ঞান আর অপরিচিত কণ্ঠস্বর। ...

সাংকেতিক শব্দ, বনহুর মনোযোগ দিয়ে শুনলো এবং টেপ করে চললো। কোন গোপন স্থানে স্থাপিত ট্রান্স মিটার থেকে শর্ট ওয়েভে বেতারে সাংকেতিক ভাষায় কথা হচ্ছিলো। বনহুরের ওয়্যারলেস যন্ত্রটি ছিলো অতি সূক্ষ্ম। যে কোন গোপন ট্রান্সমিটারের বা বেতারের অনুষ্ঠান এই ওয়্যারলেসে ধরা পড়তো।

বনহুর শব্দগুলি টেপ করে নেবার পর ফিরে এলো তার দরবার কক্ষে। দরবার কক্ষে রহমান আর কায়েস ছিল তার পাশে।

বনহুর তার ওয়্যারলেস থেকে ধরা টেপ করা শব্দগুলি শুনলো একবার—দু'বার—তিনবার।

বনহুরের ললাটে গভীর চিন্তা রেখা ফুটে উঠলো। বললো সে এবার—রহমান যে ভাষা বা শব্দগুলো আজ আমি আমার কৌশলি ওয়্যারলেস যন্ত্র থেকে টেপ করতে সক্ষম হয়েছি এই শব্দগুলো আমাকে বিদেশী ঘাটি আবিষ্কারে অনেক সহায়তা করবে। কান্দাই হত্যা রহস্য ব্যাপার নিয়েই কান্দাই কোন গোপন ঘাটি থেকে বাইরের কোন দেশের সঙ্গে আলাপ চলছিলো। গতরাতে ডাঃ রায় গ্রেপ্তার হয়েছে এবং তার গবেষণারগার পুলিশ মহল দখল করে নিয়েছে এটাই জানানো হলো। আমার ওয়্যারলেস মেশিনে মিটার সংযোগ করা আছে যে মিটারে ধরা পড়েছে কান্দাই শহরের কত মাইলের মধ্যে এবং কোন দিকে এই বেতার যন্ত্র থেকে সাংকেতিক শব্দগুলো ভেসে এসেছিলো। থামলো বনহুর।

রহমান তাকালো বনহুরের হাতে একখানা কাগজ ছিলো সেই দিকে।

বনহুর কাগজখানা মেলে ধরে বললো—এই দেখো...

বনহুরের হাতের কাগজখানা একটি ম্যাপ। বনহুর ম্যাপটির এক জায়গায় আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—এই পর্বতমালা দেখছো এখানেই

কোন এক স্থান থেকে বেতার যন্ত্রে এই সাংকেতিক শব্দগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করছি।

রহমান মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিলো এবার বললো সে—সর্দার, এ যে কান্দাই পর্বতমালা।

হাঁ, এই পর্বতমালার কোন এক গোপন স্থানে এদের ঘাটি আছে। রহমান, আমি ঘাটির সন্ধানে আজ রওয়ানা দিতে চাই। তুমি তাজকে প্রস্তুত করতে বলো।

সর্দার।

হাঁ, আমি একাই যাবো।

কিন্তু—

পরে হয়তো তোমাকেও প্রয়োজন হবে। বনহুর ম্যাপখানা মনোযোগ সহকারে দেখছিলো। হঠাৎ বলে উঠলো রহমান —এই পর্বতমালায় আমি একদিন সেই লোমশদেহি ড্রাইভারকে ফলো করে পৌঁছে গিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন আমি ব্যর্থ হয়েছি.....

সর্দার, এই পর্বতমালা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আর রহস্যময়। এই পর্বতের কোন এক গুহায় মাঝে মাঝে নাকি নীলাভ আলো জ্বলতে দেখা যায়।

নীলাভ আলো?

হাঁ।

কই কোনদিন তো একথা তোমরা আমাকে বলোনি রহমান?

বলবার মত কোন সুযোগ আসেনি তাই বলা হয়নি।

বনহুর বললো—হুঁ। তার চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠলো জ্বলজ্বল করে। বললো আবার—রহমান, তুমি কি নিজে দেখেছো এই নীলাভ আলো?

না সর্দার।

তবে কে দেখেছে?

আমাদের অনুচর সিমলাই।

তাকে এক্ষুণি ডেকে আনো আমার কাছে।

রহমান কায়েসের দিকে তাকিয়ে বললো—যাও কায়েস সিমলাইকে ডেকে আনোগে।

কায়েস চলে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো কায়েস এবং তার সঙ্গে সিমলাই।

বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে সিমলাই সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো—তুমি কান্দাই পর্বতমালায় কবে কখন নীলাভ আলো দেখেছো?

সিমলাই বললো—সর্দার, আমি স্বচক্ষে দেখিনি তবে শুনেছি...

তুমিও স্বচক্ষে দেখোনি, শুনেছো?
হাঁ সর্দার। আমি সে কথাই রহমান ভাইকে বলেছিলাম।
কার কাছে শুনেছো?
আমার চাচার কাছে।
চাচা?
হাঁ সর্দার।
কে তোমার চাচা?
আমার চাচা হিমলাই সিং।
কোথায় থাকে সে?
ফিরু গ্রামে।
কান্দাই পর্বতমালার অদূরে সে ফিরু গ্রাম?
হাঁ সর্দার। আমার চাচা ফিরু গ্রামের চৌকিদার। একদিন ডিউটি দেবার সময় গভীর রাতে সে কান্দাই পর্বত মালার দিকে নীলাভ আলো দেখতে পেয়েছিলো।
শুধু একদিন?
ঠিক আমি জানিনা সর্দার।
বেশ আমি যাবো তোমাদের ফিরু গ্রামে।
আপনি যাবেন সর্দার? সিমলাই সিং ঢোক গিলে কথাটা বললো।
বনহুর বললো—হাঁ এবং আজকেই যাবো।
সর্দার।
তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। রহমান, তাজকে প্রস্তুত করতে বলো। আর সিমলাই, তুমি তোমার ঘোড়া নেবে।
সিমলাই-এর বাড়িতে যাবে তাদের সর্দার এ যে তার পরম সৌভাগ্য কিন্তু ভয়ও হচ্ছে। সর্দারকে সে কোথায় বসতে দেবে কি তার জন্য ব্যবস্থা করবে। আর কিই বা খেতে দেবে। কেমন যেন হাবা গোবা বনে যায় সে।
বনহুর বলে উঠে—সিমলাই, সাবধান! কোনক্রমে তোমার চাচা যেন জানতে না পারে আমি কে।
তবে—তবে কি বলবো সর্দার।
বলবে আমার দোস্ত। আমরা এক সঙ্গে কাজ করি। এসেছি বুড়ো চাচাকে দেখতে বাস—বুঝলে?
বুঝেছি সর্দার। ভীত চোখে তাকালো সিমলাই সর্দারের মুখে।
বনহুর বললো—যাও তৈরি হয়ে নাও গে।
সিমলাই চলে গেলো।

বনহুর এবার কায়েসকে লক্ষ্য করে বললো—কায়েস, তুমি যাও তাজকে তৈরি করোগে।

কায়েস বেরিয়ে গেলো।

রহমান আর বনহুর ধীরে ধীরে দরবার কক্ষের দরজার দিকে এগুলো।

বনহুরের হাতের মুঠায় ম্যাপখানা আর রহমানের হাতে টেপ্‌রেকর্ড অদ্ভুত মেশিন।

❑

ফিরু গ্রাম।

পাথর আর টিলার উপরে ছোট গ্রাম খানা। মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাড়, কোথাও বা বিস্তৃত প্রান্তর। ঝর্ণা আর নদী নালার অভাব নেই। ঝর্ণার দু'পাশে সবুজ ক্ষেত। নানারকম ফসলে ভরা এসব ক্ষেতগুলো।

ফিরু গ্রামের অধিবাসীরা কতকটা সাঁওতালদের মত। এদের বাড়ি ঘরগুলো পাতা আর খোলার তৈরি। কোন কোন বাড়ি ঘর মোটা কাঠের খুঁটির উপর বেশ উচুতে।

বনহুর আর সিমলাই সিং যখন ফিরু গ্রামে এসে পৌছলো তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে।

সূর্য সবেমাত্র পূর্বাকাশে উঁকি দেবে দেবে করছে। কুয়াশা তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। বনহুর আর সিমলাই নিজ নিজ অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো।

কাঠের খুঁটির উপরে পাশাপাশি দুটো ঘর। পাতার ছাউনি দিয়ে ঘর দুটো ছাওয়া। সবে মাত্র দরজার ঝাপ সরিয়ে সিমলাই এর চাচা বেরিয়ে এলো বাইরে। সাদা কালো একরাশ ঝাকড়া চুল মাথায়। বড় এক জোড়া গোঁফ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

এতো ভোরে সিমলাইকে একজন সঙ্গীসহ দেখে চাচা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—আরে সিমলাই যে।

সিমলাই চাচাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ-ধ্বনি করে উঠতো কিন্তু সে সঙ্কোচিত হয়ে পড়লো কারণ তার সঙ্গে রয়েছে সর্দার দস্যু বনহুর। তবু হাসি মুখে বললো, চাচা তোমাকে দেখতে এলাম।

চাচা বড় ভাল বাসতো সিমলাইকে কারণ ছোট বেলায় সিমলাই মা-হারা। বাবাও তার মারা গেছে পাহাড় থেকে পড়ে। পাহাড় আর পর্বতের উপরে গাছে গাছে কাঠ কাটতো সে। বাবা মা মারা যাবার পর সিমলাইকে কোলে কাঁখে করে মানুষ করেছে ওরা চাচা। তাই ওকে বড় ভালবাসে।

চাচা কিন্তু সিমলাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো।

চাচী ছিলো ঠিক তার বিপরীত। সিমলাইকে সে দু'চোখে দেখতে পারতোনা। তাই সিমলাই-এর মনে ছিলো একটা দূর্বলতা। চাচীকে সে বড় ভয় করতো ঠিক যমের মত।

চাচা সিমলাইকে জিজ্ঞাসা করলো—এটা বুঝি তোর দোস্ত?

সিমলাই ঢোক গিলে মাথা দোলালো।

চাচা এবার বললো—চল তোরা বসবি চল।

চাচা এগুলো, সিমলাই এবং বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।

কাঠের সিড়ি বেড়ে উঠরে উঠে এলো চাচা, সঙ্গে দু'জন।

ছোট্ট মাচাঙ্গে দাওয়া।

কয়েকটা জলচৌকি ধরণের ছিলো, চাচা নিজে একটিতে বসে সিমলাই আর বনহুরকে বসার জন্য ইংগিৎ করলো।

সিমলাই তাকালো বনহুরের দিকে, চোখে তার শ্রদ্ধা আর ভয়।

বনহুরকে সে বসার জন্য অনুরোধ জানালো তার দৃষ্টির মাধ্যমে।

বনহুর আসার সময় বারবার সাবধান করে দিয়েছে তাকে যেন ভুল ক্রমেও সে সর্দার বলে না ডাকে।

সিমলাই-এর মুখে বহুবার সর্দার কথাটা তাই আসতে গিয়েও আটকে যাচ্ছিল।

বসলো বনহুর।

এবার সিমলাই জড়ো সড়ো হয়ে বসলো একটা জলচৌকিতে।

চাচা বললো—কেমন ছিলি রে সিমলাই?

ভাল ছিলাম চাচা।

তুই যেখানে কাজ করিস সেখানে এ বুঝি কাজ করে?

সিমলাই কোন জবাব দেবার আগেই বলে উঠে বনহুর—হাঁ চাচা, আমি সেখানেই কাজ করি।

তোর নাম কি বাপ?

সর্দারকে তার চাচা তুই বলছে এটা বড় খারাপ লাগলো সিমলাই-এর কাছে। মুখখানা সে কাঁচু মাঁচু করে ফেললো।

বনহুর চাচার কথার জবাব দিলো—আমার নাম রংলাল।

বাঃ বাঃ! চমৎকার নাম তোর বাপ। তা মনিব তোকে কত দেয়?

মাথা চুলকে জবাব দেয় বনহুর—সিমলাই যা পায় আমিও তাই পাই চাচা।

বনহুরের কথা বার্তায় চাচা খুব খুশি হয়ে পড়লো।

চাচা বললো—তোরা ক'দিন থাকবি তো, না রে সিমলাই?

এবারও বনহুর জবাব দিলো—হাঁ চাচা, দু'চার দিন থাকবো আমরা।

সিমলাই মাথা চুলকায় কারণ সে জানে তার চাচী কত বড় সাংঘাতিক মানুষ। এখানে বেশীক্ষণ তার থাকার ইচ্ছা নেই। চাচী যখন জানতে পারবে তারা এখানে দু'চার দিন থাকবে তখন একটা ভীষণ কান্ড বাঁধিয়ে বসবে। আসবার সময় সর্দার তাকে এমন কিছু বলেনি যে সেখানে তারা থাকবে।

সিমলাই তাই একটু হাবা বনে গেলো।

চাচা ঘরে প্রবেশ করতেই ঘন ঘনে গলা শোনা গেল—কে বাইরে কথা কয়?

চাচার গলা—সিমলাই আর তার এক দোস্ত এসেছে।

চাচী বোধ হয় তখনও শয্যাত্যাগ করেছিলো না। বিছানায়? শুয়ে শুয়েই চাচাকে প্রশ্ন করেছিলো এবার মনে হলো চাচী শয্যা ত্যাগ করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললো—সিমলাই আর তার দোস্ত এসেছে।

বলিস—কি?

হাঁ, ওরা সারারাত ধরে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। শীতের রাত, বেচারীরা খুব কষ্ট পেয়েছে। একটু খেতে দেবো ভাবছি।

কি—কি কইলি? খেতে দিবি ওদের!

হাঁ, খেতে দেবো।

বড় আমার মরদ রে! আমি তোর ভাই পুতের জন্য খাবার তৈরি করে রেখেছি না?

কথাবার্তা ঘরের ভিতরে হলেও বাইরে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো।

সিমলাই-এর মুখ কালো হয়ে উঠেছে, সে বার বার ভীত চোখে তাকাচ্ছে সর্দারের মুখে। হায় হায় সর্দার এর জন্য তাকে কি শাস্তি দেবে কে জানে।

কিন্তু সর্দারের মুখে সে কোন ক্রুদ্ধভাব দেখতে পেলো না। তবু তার ভয় আর আশঙ্কা।

এমন সময় বেরিয়ে এলো চাচা, দু'হাতে দু'টো থালা, থালা দু'খানায় কিছু ফলমূল আর পিঠা।

চাচা থালা দু'খানা এনে সবেমাত্র সিমলাই আর বনহুরের হাতে দিয়েছে অমনি চাচী রাক্ষসী মূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে এলো। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—রাত ফর্সা হতে না হতেই দোস্ত সঙ্গে হাজির হয়েছিস। তোর মরা বাপ মা কি এখানে সব তৈরি করে রেখে গেছে হতভাগা? নিজেই খেতে পাসনা তার আবার ঢং দেখো, দোস্ত এনেছে সঙ্গে করে।

সিমলাই-এর মুখ মরার মুখের মত ফ্যাকাশে হলো। সে একলা হলে এমন কত গালাগাল নীরবে হজম করে ফেলে কিন্তু তার সঙ্গে যে সর্দার

স্বয়ং এসেছেন তাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে। সিমলাই এর যেন মাথা কাটা যাচ্ছিলো। কি করবে সে ভেবে পাচ্ছিল না। চাচাও একেবারে নাজেহাল, বৌ-এর কথায় কোন জবাব দিতে পারছিলো না। বৌকে তার বড় ভয় কারণ বড্ড ঝগড়াটে মেয়ে সে। একটুতেই ঝাটা নিয়ে মারতে পর্যন্ত আসে।

চাচা কোন কথা না বলে নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলো।

চাচী বললো—নে, খেয়ে শীগগীর বিদেয় হয়ে যা।

সিমলাই না খেলেও বনহুর কিন্তু খেতে শুরু করে দিয়েছে। তার মুখোভাবে কোন তিক্ততা বা ক্রুদ্ধতাভাব নেই। চাচীর গালাগাল যেন তার গায়েই লাগছে না।

সিমলাই যেন কতকটা আশ্চর্য হলো।

বনহুর বললো—খাও দোস্ত।

সিমলাই এবার কম্পিত হাতে থালা থেকে খাবার তুলে খেতে শুরু করলো।

বনহুর কিন্তু ফলমূল ছাড়া পিঠা বা অন্য জিনিস কিছু মুখে দিচ্ছে না।

খাওয়া শেষ হলো এক সময়।

চাচা এবার ভয় কম্পিত কণ্ঠে বৌকে লক্ষ্য করে বললো—ওরা বহুদূর থেকে এসেছে এক্ষুণি কেমন করে যাবে বল্ লাছ্মা? ওদের থাকতে বল না।

রুখে দাঁড়ালো স্বামীর দিকে মুখ করে লাছমা। মাথায় ঝাকুনি মেরে বললো—সিমলাই একা এলে না হয় দু'এক দিন থাকতো। ঐ দোস্তটা কি কম খাবে?

সিমলাই এর হাত থেকে শেষ খাবার টুকু পড়ে গেলো ভীত নজরে তাকালো সে সর্দরের মুখে।

বনহুর একটু হেসে বললো—চাচী, আমিও তোমার সিমলাই-এর মত। দুটো দিন খেলামই বা।

পারবি, কাঠ কেটে আনতে পারবি তুই? চাচী এবার বনহুরকে লক্ষ্য করে কথাটা বললো।

বনহুর খুশি হয়ে বললো—পারবো! পারবো চাচী যত কাঠ চাও আমি এনে দেবো।

ঐ যে পাহাড় দেখেছিস ওখান থেকে কাঠ কেটে আনতে হবে পারবি তো?

পারবো।

চাচী বললো—তবে দু'দিন থেকে যাবি ওর সঙ্গে। সিমলাইকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো সে।

বনহুর মাথা দোলালো—আচ্ছা।

এতোক্ষণে চাচার মুখটায় হাসি ফুটলো। যা হোক তবু ভাইপো দু'দিন থেকে খাওয়ার অনুমতি পেলো।

চাচী ঘরে ঢুকে দু'টো ধারালো কুড়োল এনে একটা সিমলাই আর একটা বনহুরের হাতে দিয়ে বললো—এই নে এবার যা ঐ পাহাড়ের জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনগে। এলে ভাত পাবি।

সিমলাই ঢোক গিললো।

বনহুর হাসি মুখে কুড়োল দু'খানা চাচীর হাত থেকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সিমলাইও সর্দারের সঙ্গে উঠে পড়লো।

বনহুর একটা কুড়োল সিমলাই এর হাতে এগিয়ে দিয়ে বললো—চলো দোস্ত।

চাচা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো, বললো—লাছমা, আমাকে একটা কুড়োল দে। আমিও কাঠ কাটতে যাবো।

চাচার ভয় সিমলাই-এর বাবা গাছ থেকে পড়ে মরেছে, পাছে সিমলাই পড়ে মরে তাই সেও সঙ্গে যাবে এই তার ইচ্ছা।

চাচী কিন্তু খেঁকিয়ে উঠলো—তোকে আর যেতে হবেনা! ওরা দু'জন যোয়ান মরদ আছে। আজ তুই বাড়ি বসে আরাম কর।

বনহুর আর সিমলাই সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

চাচা কাঠের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলো আর চাচা রাক্ষুসী মূর্তি নিয়ে কট মট করে তাকাচ্ছে।

নিচে নেমে একবার বনহুর তাকিয়ে দেখে নিলো চাচীর মূর্তিটা।

ওরা দু'জন এবার কান্দাই পর্বতমালার দিকে পা বাড়ালো।

সিমলাই চলতে চলতে বললো—সর্দার আপনি কাঠ কাটবেন এও কি হয়?

হেসে বললো বনহুর—কেনো আমি কি মানুষ নই?

সর্দার আমার চাচী বড্ড বদরাগী।

তাতো দেখতেই পেলাম।

ঐ চাচীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই তো আমি.....

আমাদের দলে যোগ দিয়েছো।

হাঁ সর্দার! কিছুক্ষণ মৌনভাবে চলে ওরা দু'জনা।

বনহুরের কাধে কুঠার। দেহের পোশাক তার ঠিক সিমলাই-এর মত। তাকেও একজন শ্রমিক বলে মনে হচ্ছিলো।

বনহুর চলতে চলতে বললো—তোমার চাচা বড় ভাল মানুষ সিমলাই।

হাঁ-সর্দার চাচা আমার বড় ভাল কিন্তু চাচীটার জন্য সংসারে শান্তি নাই। সর্দার আমার চাচী আপনাকে যাতা বললো, অপমান করলো—সে জন্য আমি মাফ চাই সর্দার।

হাসলো বনহুর—পাগল তুমি সিমলাই। চাচী আমাকে যাতা বললো বলে আমি রাগ করবো তোমার উপর? তোমার চাচী আমারও চাচী একটু গাল মন্দ করলোই বা।

তবু.....

ও তুমি কিছু মনে করোনা।

সর্দার আপনি যে নীলাভ আলোর কথা চাচাকে জিজ্ঞাসা করবেন বলে ছিলেন?

করবো কিন্তু আজ নয়। সিমলাই!

বলুন সর্দার!

আমি তোমার চাচার বাড়ি কয়েকদিন থাকতে চাই।

ভাল কথা সর্দার কিন্তু আমার চাচীটা বড় চেঁচামেঁচি করে।

ও আমি সহ্য করে নেবো। আচ্ছা সিমলাই তোমার চাচী কি খেতে ভালবাসে?

একটু চিন্তা করে বললো সিমলাই—চাচী হরিণের মাংস খেতে খুব ভালবাসে।

বেশ, তোমার চাচী যাতে খুশি থাকে আমি তাই করবো। কারণ আমাকে তোমার চাচীর বাড়িতে থেকে কাজ করতে হবে। কিন্তু সাবধান! তোমার চাচা কিংবা চাচী যেন আমার আসল পরিচয় জানতে না পারে।

না, পারবে না সর্দার। তবে হঠাৎ আমার মুখে সর্দারটা এসে পড়ে।

খবরদার! যেন ভুল করেও কখনও সর্দার বলো না। দোস্ত বলবে।

আচ্ছা সর্দার।

আবার সর্দার?

না না আর বলবো না।

বলো দোস্ত।

দোস্ত আর বলবোনা!

যখন বনহুর আর সিমলাই কাঠ নিয়ে বাড়ি ফিরলো তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

চাচা ঘর বার করছিলো কারণ সেই সাত সকালে সিমলাই আর তার দোস্ত গেছে পাহাড়ে কাঠ কাটতে। এখন সন্ধ্যা হয়ে এলো তবু ফিরে এলো না তাই তার চিন্তা। চাচী অবশ্য বার বার বলছে ওরা মরবে না, ওদের যমের প্রাণ। যখন ওরা দু'জন ফিরে এলো তখন খেকিয়ে বেরিয়ে এলো

চাচী। দু'হাত মাজায় রেখে বললো—দেখলি ও মরদ, দেখলি, আমি বলেছি ওদের যমের জান মরবে না। দে এবার খেতে দে।

চাচা মুখ কাঁচু মাঁচু করে বললো—দেখলি কত কাঠ কেটে এনেছে। অনেক কাঠ, বাজারে বেচলে অনেক পয়সা হবে। লাছমা এবার তুই খাইতে দে।

লাছমা ক্রুদ্ধভাবে সিমলাই এর দিকে তাকিয়ে বললো—ওখানে রাখ।

যাক তবু ভরসা হলো চাচার।

সে নিজ হাতে ওদের মাথা থেকে কাঠের বোঝাগুলো নামিয়ে রাখলো। তারপর বললো—যা তোরা ঝর্ণা থেকে হাত মুখ ধুয়ে আয়।

ওরা হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখলো চাচা আর চাচী মিলে তাদের জন্য খাবার নিয়ে বসে আছে।

পেট পুরে খেলো বনহুর আর সিমলাই।

বনে যাবার সময় বলে গেছে সিমলাই তার চাচাকে, আমার দোস্ত ফল খেতে বড় ভালবাসে। তাই চাচা অনেক ফল জোগাড় করে রেখেছিলো। বনহুর ইচ্ছামত ফল খেলো।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলো—তার খেজুর পাতার চাটাইটার উপরে দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললো—সিমলা আয় আমার গা টিপে দিবি আয়। বড্ড ব্যাথা করছে গা আমার।

সিমলাই কি করবে অগত্যা উঠে এলো চাচীর পাশে। জানে সিমলাই চাচীর অভ্যাস তার খাওয়া হলেই গা টিপতে হবে। কোন অতিথি এলেও বাদ যায় না। সিমলাই তাড়াতাড়ি এসে চাচীর পা টিপতে বসলো।

চাচী কিন্তু মাথা উঁচু করে দেখছিলো, এবার ডাক দিলো—এই সিমলার দোস্ত আয় তুই আমার গা টিপে দিবি আয়।

এবার বনহুরের মুখখানা কালো হলো বিশেষ করে সিমলাই তার অনুচর ওর সামনে একটা মেয়ে মানুষের গা টিপবে কেমন করে, যেন সঙ্কোচ লাগছে তার তবু বিলম্ব করলো না সে, আবার যদি রেগে যায় চাচী।

সিমলাই-এর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, ফ্যাকাশে লাগছে তার চোখ দুটো। লজ্জায় মটির সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছিলো সে। সর্দারকে তার চাচী গা টিপতে বললো এ যেন তার ফাঁসির হুকুম।

বনহুর উঠে এসে চাচীর পাশে বসলো।

চাচী এবার তার মোটা মোটা হাত দুখানা তুলে দিলো বনহুরের কোলে—ভালো করে টিপে দে নইলে কাল খেতে দেবোনা।

সিমলাই যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছিলো।

বনহুর সুন্দরভাবে চাচীর গা টিপতে শুরু করলো।

চাচী খুশিতে ডগ মগ হয়ে উঠলো, হেসে বললো—বাঃ বাঃ এতো সুন্দর গা টিপতে পারিস তুই? খুব ভাল-খুব ভাল.....আর সিমলাটা বড় আসলে দেখসিচ না আমার পা দু'খানায় যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হতভাগা শুধু গিলতে পারে—কাজ পারেনা।

চাচীর প্রশংসায় বনহুর আনন্দে আত্মহারা হলো। যাক তবু চাচীকে সে খুশি করতে পেরেছে। কাল আবার হরিণের মাংস খাওয়াবে, তাহলে যায় কোথা। খুব করে গা টিপছে বনহুর।

সিমলাই কিন্তু ঘুমে ঢুলছে।

চাচীর ও নাক ডাকছে এবার।

চাচা তো অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বনহুর ডাকলো—সিমলাই?

চমকে উঠে জবাব দিলো সিমলাই—সর্দার।

বনহুর ঠোঁটে আঙ্গুল চাপ দিয়ে বললো—আবার।

নাক কান মলে বললো সিমলাই—আর বলবো না।

বনহুর বললো—তুমি ঘুমাও সিমলাই আমি একাই তোমার চাচীর পা টিপে দিচ্ছি।

আপনি.....আপনি একা একা চাচীর গা টিপবেন আর আমি ঘুমাবো তা হয়না।

আমি বললাম তুমি ঘুমাও.....যাও শুয়ে পড়ো।

সিমলাই-এর চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করছিলো, সারাদিন সে কাঠ কেটেছে, বড় ক্লান্ত অবসন্ন লাগছে তার। বেশি জেদা জেদি না করে শুয়ে পড়লো সিমলাই আলগোছে।

বনহুর চাচীর গা টিপছে বসে বসে।

এমন সময় ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। চাচীর দেহটা তো এলিয়ে পড়েছে, ঘুমে অচেতন সে।

বনহুর এবার উঠে দাঁড়ায়।

বেরিয়ে আসে সে কক্ষের বাইরে।

আকাশে অসংখ্য তারার মালা। কিন্তু চারিদিকে জমাট অন্ধকার। বনহুর দাওয়ায় দাঁড়িয়ে তাকায় সম্মুখে। দূরে অনেক দূরে কান্দাই পর্বতমালা, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সিমলাই বলছিলো তার চাচা নাকি দেখেছে ঐ পর্বতমালার কোন অংশে গভীর রাতে নীলাভ আলো জ্বলতে দেখা যায়। চাচাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে' হাঁ তাই। কিন্তু বনহুর নিজের চোখে দেখবে কেমন আলো কিসের আলো। এই আলোর পিছনে লুকানো আছে গভীর কোন রহস্য। এজন্য তাকে চাচার বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে। যত

দিন না এই নীলাভ আলো রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়েছে ততদিন তাকে থাকতে হবে এখানে। বনহুরের মনে হয় কান্দাই হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে এই নীলাভ আলোটি।

বনহুর তার পকেট-থেকে বের করে ক্ষুদে বাইনোকুলারটি। চোখে লাগিয়ে তাকিয়ে থাকে সম্মুখের পর্বতমালার দিকে।

হঠাৎ তার বাইনোকুলারে ধরা পড়ে ক্ষুদ্র একটি আলোর বিন্দু।

আশার আনন্দে নেচে উঠে বনহুরের মন। কিন্তু মুহূর্তের জন্য আলোর বিন্দুটা দেখা যায় মাত্র তারপর আর কিছু নজরে পড়ে না।

বনহুর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে পুনরায় আলোর বিন্দুটা নজরে আসে কিনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও আর আলোর বিন্দুটা জ্বলে উঠলোনা।

বনহুর ফিরে এলো তার বিছানায়।

পরদিন ঘুম ভাংতেই শুনতে পেলো চাচীর গলা—এই সিমলাই এবার উঠ। কাঠ কাটতে যাবি কখন?

বনহুর চোখ রগড়ে উঠে বসলো।

সিমলাই তখনও নাক ডাকাচ্ছে।

বনহুরের ভয় হলো চাচীর মাথা বিগড়ে না যায় তাই সে উঠে সিমলাইকে জানালো তারপর বললো—চলো দোস্ত কাঠ কাটতে যাই।

চাচী তাড়া হুড়ো করে নাস্তা তৈরি করে দিলো।

আজ কিন্তু সে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। নিজের হাতে নাস্তা তৈরি করে নিজেই খেতে দিয়ে বললো—তোরা পেট পুরে খা। সেই সন্ধ্যা বেলা আসবি বড় খিদে পাবে।

চাচীর কথায় দরদ ঝরে পড়ে।

সিমলাই-এর চোখে কিন্তু পানি এসে যায়। চাচীর গলায় এমন দরদ ভরা কথা সে কোনদিন শোনেনি। হয়তো মা থাকলে তাকে এমনি করে খেতে বলতো।

বনহুর খেতে শুরু করে।

শিমলাই খেতে শুরু করলো।

চাচী আজ পাশে বসে খাওয়ালো দু'জনাকে।

বনহুর আজ কাঠ কাটতে যাওয়ার সময় একটা তীর ধনু সঙ্গে নিলো। চাচীকে আজ সে হরিণের মাংস খাওয়াবে।

আজও বনহুর আর সিমলাই সারাদিন বনে ঘুরে অনেক কাঠ কাটলো। ভাগ্য ভাল বলতে হবে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে একটা হরিণের বাচ্চা বনহুরের

নজরে পড়লো। আর যায় কোথায়, বনহুর তার তীর বিদ্ধ করলো হরিণ বাচ্চার পাঁজরে।

আজ বনহুর আর সিমলাই শুধু কাঠ নিয়েই ফিরলো না তার সঙ্গে হরিণের বাচ্চাও তারা এনেছে।

চাচী তো খুশিতে ডগ মগ। হরিণের বাচ্চার মাংস তার অতি প্রিয় খাদ্য। সুন্দর করে রাঁধলো চাচী হরিণের মাংস। বনহুর আর সিমলাইকে পেট পুরে খেতে দিলো।

আজও আবার চাচীর গা টিপতে হবে না কি? বললো বনহুর।

সিমলাই মাথা চুলকে বললো—চাচীর অভ্যাস। কেউ না থাকলে গোটারাত চাচা ওর গা টিপে দেয়।

তোমার চাচা হা হলে চৌকিদারির ডিউটি করে কখন?

চাচাকে সপ্তাহে তিন দিন ডিউটি করতে হয় আর বাকি চার দিন আর একজন আছে সেই করে। চাচা আবার ডাক বাংলায় কাজ করে কিনা।

ডাক বাংলো।

হাঁ, ঐ পূর্বদিকে একটা ডাক বাংলো আছে। আপনি দেখেননি ওটা।

এখানে ডাক বাংলো আছে তাতো জানতোম না।

আছে। ওখানে শহর থেকে মাঝে মাঝে বড় বড় সাহেবরা আসেন, থাকেন পাহাড়ে শিকার করেন্।

বনহুর বললো—আজ আমাকে তোমাদের ডাক বাংলোয় নিয়ে যাবে।

আচ্ছা সর্দার।

আবার সর্দার বললে? দোস্ত তোমার মুখে আসেনা। আর শোন আপনি বলবেনা এখন থেকে আমাকে তুমি বলবে।

মাথা চুলকায় সিমলাই।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—ফের যদি আপনি আর সর্দার বলছো তাহলে শাস্তি পাবে।

আচ্ছা আর আমার ভুল হবে না।

কুড়াল কাঁধে পরদিন বের হলো বনহুর আর সিমলাই। আজ ওরা বাংলোর পথে পা বাড়ালো। পাথর আর টিলা অতিক্রম করে এগিয়ে চললো ওরা। মাঝে সাঝে ঝর্ণাধারা ছোট ছোট পাথরের উপর দিয়ে আছাড় খেয়ে নিচে নেমে চলেছে। সূর্যের আলোয় ঝর্ণার পানির রূপালী বর্ণ সোনালী আকার ধারণ করেছে। অপূর্ব এ শোভা উপভোগ করতে করতে এগুচ্ছে বনহুর।

দস্যু হলেও সে মানুষ তাই তার মনকেও প্রকৃতির সৌন্দর্য-আকৃষ্ট করে। বনহুর এগুচ্ছিলো আর মুগ্ধ নয়নে দেখছিলো।

বাংলোর নিকটে পৌঁছে আরও মুগ্ধ হলো বনহুর। অতি সুন্দর মনোমুগ্ধকর জায়গায় বাংলোটা লাল মাটির বিস্তীর্ণ ভূ-খন্ডের উপরে ছোট লাল রংএর ডাক বাংলো।

বাংলোর পাশ কেটে চলে গেছে একটি পাহাড়িয়া নদী। নদীটায় বেশি পানি নেই, সচ্য সাবলীল পানির নিচে পাথরের নুড়ীগুলো সূর্যের কিরণে ঝলমল করছে।

বনহুর পা ডুবিয়ে একটু হেটে নিলো। হঠাৎ মনে পড়লো তাকে কাঠ নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। না হলে চাচী রেগে আগুন হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

বললো বনহুর—সিমলাই চলো এবার বনে যাই। কাঠ কাটতে না পারলে তোমার চাচী বড় ক্রুদ্ধ হবে।

চাচীর কথা মনে পড়তেই সিমলাই এর মুখ খানা ম্লান হলো তাড়াতাড়ি উঠে বললো—চলুন সর্দার।

গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আবার সর্দার।

এখানে কেউ নেই তাই.....

তবু বলবে না।

আচ্ছা।

কাঠ কেটে যখন তারা বাড়ি ফিরলো তখন বেলা পড়ে এসেছে। আজ কিন্তু চাচী খুশি হয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানালো। বেশ হাসি হাসি মুখ যেন কত দরদিনী।

বনহুর যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

আজও আবার সেই অবস্থা।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর চাচীর শরীর দাবিয়ে দেওয়া।

আজ চাচার ডিউটি কাজেই খাওয়া দাওয়া সেরে চাচা চলে গেলো বাম হাতে লণ্ঠন আর ডান হাতে পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে।

আজ সিমলাই হাত আর বনহুর পা টিপতে বসলো চাচীর।

বেশিক্ষণ আজ পা টিপতে হলো না।

শিমলাই ঘুমিয়ে পড়লো অল্পক্ষণেই।

চাচীর নাক ডাকছে।

বনহুর বেরিয়ে এলো বাইরে।

নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি।

কাঠের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বনহুর তাকালো সম্মুখে পর্বতমালার দিকে। পর্বতমালার পাদমূলে ঘনজঙ্গল। জঙ্গলের মাঝে স্থানে স্থানে ছোট ছোট টিলা।

বনহুর বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছে।

আজ কোন আলো দেখা গেলো না। এক সময় নীরাশ হৃদয় নিয়ে ফিরে এলো ঘরে। বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুমাতে পারলো না সে। এপাশ ওপাশ করতে লাগলো বনহুর। মনে তার নানা চিন্তার জাল ছড়িয়ে পড়েছে। কান্দাই পর্বত মালার কোন স্থানে ডাঃ রায় এবং তাদের দলের ঘাটি আছে। বনহুরের মনে পড়ে সে দিনের কথা লোমশ দেহে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এই পর্বতেরই কোন এক স্থানে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। অনেক চেষ্টা করেও আর তাকে খুঁজে পায়নি।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো বনহুর খেয়াল নেই, হঠাৎ চাচার ডাকে ঘুম ভেংগে যায়। ধড়মড় উঠে দরজার ঝাপ খুলে বলে চাচা।

হাঁ বাবা একটা খবর নিয়ে তাড়াতড়ি ছুটে এলাম। কি খবর চাচা?

ডাক বাংলোয় আজ বড় সাহেব আসবেন সঙ্গে তাঁর মেয়েও আসবে। খবর নিয়ে দারওয়ান আর বাবুর্চি এসেছে।

বড় সাহেব!

হাঁ বাপ বড় সাহেব।

কে সে চাচা? নাম কি তার?

বড় সাহেবকে তুই চিনিস না? এই অঞ্চলের মালিক তিনি। এই যে ফিরু গাঁও দেখছিস এটা ছাড়াও আরও ছ'টা গাঁও আছে। এই সবগুলো গাঁও এর মালিক। তাছাড়া পাহাড়তলির সব জায়গাগুলো তার। বড় ভাল মানুষ তিনি তার চেয়ে তার মেয়ে আরও ভাল জানিস বাপ।

তাতো বুঝলাম চাচা কিন্তু তার নাম কি বললেন না?

বড় সাহেবের নাম আমির আলী কায়েসী...তার মেয়ের নাম...

বা চমৎকার নাম চাচা তোমার বড় সাহেবের। থাক মেয়ের নাম আর বলতে হবে না...

চাচা এবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলে উঠে—আমার যে অনেক কাজ বাকি আছে বাবা। ডাক বাংলো গোছাতে হবে, বাগান সাফ করতে হবে। বাগানে অনেক ঘাস জন্মেছে বড় সাহেব কিছু বলবে না কিন্তু তার মেয়ে বলবে সিমলাই এর চাচা তুমি বড় আলসে মানুষ এসব কিছু করো না। বখশিস মিলবে না কিছু.....

তুমি কিচ্ছু ভেবো না চাচা আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

ততক্ষণে সিমলাই এবং তার চাচী জেগে উঠে তাদের কথা শুনছিলো।

চাচী বলে উঠলো—হাঁ-হাঁ রংলাল তোকে সাহায্য করবে। আজ সিমলাই একাই যাবে বনে কাঠ কাটতে।

চাচীর কথায় কেউ প্রতিবাদ করতে সাহসী হবে না। সিমলাই বললো—আমি চাচার সঙ্গে কাজ করে তারপর কাঠ কাটতে যাবো। দোস্ত আজ আরাম করুক.....

বনহুর বলে উঠলো—আরাম করার দরকার হবে না দোস্ত তুমি চাচীর কথামত কাজ করো।

চাচার সঙ্গে আজ বনহুর চললো ডাক বাংলা অভিমুখে।

সিমলাই মুখখানা ম্লান করে ফেললো কারণ সর্দারকে শেষ পর্যন্ত মালির কাজ করতে হলো। যে সর্দারের ভয়ে তারা সর্বক্ষণ তটস্থ থাকে, মুহূর্তে মুহূর্তে কুর্নিশ জানাতে হয় আর তারই সম্মুখে সে দিব্যি আরামে খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে আবার ঘুমচ্ছেও। সিমলাই সঙ্কোচিত হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে।

বনহুর তখনও অভয় দান করে! বুঝতে পারে সে সিমলাই-এর মনোভাব!

বনহুর চাচার সঙ্গে মনোযোগ সহকারে কাজ করছে। এক সময় বললো বনহুর, চাচা তুমি বাংলো পরিষ্কার করোগে আমি বাগান সাফ করছি।

খুশি হলো চাচা, বললো—হাঁ বাপ আমি বাংলোটা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করিগে সাহেবের গাড়ি এসে পড়বে এক্ষুণি।

দারওয়ান আর বাবুর্চি তাদের নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

বনহুর মাথায় গামছা বেঁধে বাগান সাফ করছিলো।

দারওয়ান হুকুম করলো—এই মালি জলদি জলদি বাগান সাফ কর। বেটা মাইনে আর বখশিস খাস, কাজ করতে পারিস না?

এই করছি।

কেনো এতদিন সাফ করে রাখতে পারিসনি।

দারওয়ানের চিৎকার শুনে বেরিয়ে আসে চাচা, সে হাতে হাত রগড়ে বলে—ওকে কেনো গালমন্দ দিচ্ছো এ বাগান আর বাংলো দেখাশোনার ভার আমার উপর আছে। ও আমার ভাই-পোর দোস্ত...

তা এতোদিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমছিলি বুড়ো?

মুখখানা ম্লান করে বললো—হাঁ আমি বুড়ো মানুষ, এক একা এতো বড় বাগান কি রোজ আমি সাফ করতে পারি?

তোর ভাই-পো আর তোর ভাই-পোর দোস্ত কি করে? ওরা তো কাজ করতে পারে।

পারে কিন্তু ওরা এখানে থাকে না, বেড়াতে এসেছে...

বেটা এই যে সাহেবের গাড়ি এসে গেছে...

সত্যই বড় সাহেবের বিরাট নীলাভ মাষ্টার বুইক গাড়িখানা দূরে দেখা গেলো।

বনহুরও দেখছিলো তাকিয়ে গাড়িখানাকে।

চাচা বললো—রংলাল বড় সাহেব এসে গেছে।

দেখতে দেখতে গাড়িখানার নিকটে এসে পড়লো।

দারওয়ান বাংলোর গেট খুলে সেলুট করে দাঁড়ালো।

চাচাও সালাম দিলো।

গাড়িখানা চলে গেলো লাল কাঁকড় বিছানো পথ বেয়ে বাংলোর গাড়ি বারেন্দার দিকে।

গাড়ি চালাচ্ছে বড় সাহেব নিজে আর পিছন আসনে বসে আছে এক তরুণী।

এক নজরে বনহুর বাগানের ওপাশ থেকে দেখে নিলো গাড়ির ভিতরটা। ড্রাইভ আসনে যিনি বসে আছেন তিনি প্রৌঢ় ভদ্রলোক। দেহে মূল্যবান সাহেবী পোশাক। মাথায় আমেরিকান ক্যাপ ঠোঁটের ফাঁকে মোটা চুরুট। পিছনের তরুণী অল্প বয়সী হলেও বিশ বাইশ বছরের কম হবে না। তার পরণে শাড়ী মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাটা, কাঁধে ছড়িয়ে আছে। চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপষ্টিক। এর বেশি নজরে পড়লো না বনহুরের।

গাড়িখানা চলে গেলো বনহুর কাজে মন দিলো।

চাচা চলে গেলো বাংলোর মধ্যে। বড় সাহেবকে তার খুশি করতে হবে।

দারওয়ান তার কাঁধের রাইফেল বাগিয়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর ভাবছে গাড়িখানা নীলাভ। ভদ্রলোকের পোশাক পরিচ্ছদ নীলাভ বলে মনে হলো। পিছন আসনে তরুণীর শাড়িখানাকেও নীলাভ বলে মনে হলো তার। হয়তো চোখে ভুলও হতে পারে।

এক মনে কাজ করে চলেছে বনহুর।

সূর্যের তাপ ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠেছে। পাথুরিয়া লাল মাটি সীসার মত গরম হয়ে পড়েছে। বনহুরের সুন্দর মুখমন্ডল রক্তাভ লাগছে। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ পিছনে একটি কোমল কণ্ঠ —এই মালি! ঐ ফুলটা দাও তো?

বনহুর কাঁচি হাতে ফিরে তাকায়। হঠাৎ ফিরে দৃষ্টি আটকা পড়ে যায়।

তরুণীও চট্ করে তার চোখ দুটো সরিয়ে নিতে পারে না।

বনহুর স্থির নয়নে দেখছে তরুণীর পা থেকে মাথা অবধি। পাতলা গঠন হলেও একেবারে হাল্কা নয়। দেহের রং সম্পূর্ণ ফিকে গোলাপী। একরাশ রেশমী চুল ছড়িয়ে আছে কাঁধের উপর, উজ্জ্বল নীলাভ দীপ্ত দুটি চোখে কাজল টানা। ঠোঁট দু'খানা গাঢ় লিপষ্টিকরঞ্জিত। শাড়ীখানা নিলাভ। শাড়ির

সঙ্গে যোগ করে ব্লাউজটাও নীলাভ। কানে দুটো নীলাভ পাথরের দুর। হাতে দু'খানা সরু সোনার চুড়ি। পায়ের জুতো জোড়াও নীলাভ।

বনহুর তরুণীর পা থেকে মাথা অবধি দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—মেম সাহেব ফুল দেবো?

তরুণী কোন জবাব দেবার পূর্বেই বনহুর কয়েকটা ফুল তুলে নিয়ে ওর সামনে এগিয়ে ধরে নিন।

তরুণী হতভম্বের মত হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো নেয়। তখনও ওর দৃষ্টি বনহুরের মুখে স্থির হয়ে আছে। এবার তরুণী যেন সম্বিৎ ফিরে পায় ফুল হাতে দ্রুত চলে যায় সেখান থেকে।

বনহুর তরুণীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

দারওয়ান বলে উঠে—এই মালি ওমন হাঁ করে কি দেখছো! বড় সাহেবের একমাত্র মেয়ে নীলা।

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বললো—নীলা!

হাঁ—হাঁ—নীলা ওর নাম। বড় সাহেবের আদরিনী মেয়ে।

বনহুর ততক্ষণে পুনরায় কাজে মনোযোগ দিয়েছে।

চাচা তখন বাংলোর ভিতর পরিষ্কার করছিলো।

নীলা ফুলের গোছা হাতে চাচার পাশে এসে দাঁড়ায়—ও সিমলাই-এর চাচা।

কে মেম সাহেব?

হাঁ। আচ্ছা সিমলাই এর চাচা ও নতুন লোকটা কে? একেতো এর আগে দেখিনি?

ও রংলালের কথা বলছেন মেম সাহেব?

ঐ যে বাগানের যে কাজ করছে তার কথা বলছি।

ঐ তো রংলাল। সিমলাই এর দোস্ত।

সিমলাই এর বন্ধু?

হাঁ মেম সাহেব বড় ভাল ছেলে। সিমলাই এর সঙ্গে একই জায়গায় কাজ করে। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে ফিরু গাঁও দেখতে এসেছে।

চাচা কথার ফাঁকে কাজ করছিলো, নীলা বলে আবার—সিমলাই এর চাচা.....

বলুন মেম সাহেব?

রংলাল—তোমাদের ওখানেই থাকে বুঝি?

হাঁ। চাচা আবার কাজে মনোযোগ দেয়।

এবার নীলা ফিরে যায় তার বাবার পাশে।

আমীর আলী তার কক্ষের সোফায় হেলান দিয়ে বসে কিছু করছিলো।

নীলার পদশব্দে তিনি তাড়াতাড়ি পকেটে কিছু লুকিয়ে রাখলেন।
নীলা ডাকলো—আব্বু।
মা নীলা।
আব্বু দেখো কি সুন্দর ফুল গুলো।
হাঁ মা ফুল সব সময়ই সুন্দর হয় কিন্তু ঐ সুন্দর ফুলেও বিষ কীট লুকিয়ে থাকে।
আব্বু।
হাঁ মা। তাই সব সময় ফুল হাতে নিতে নাই।
আব্বু তুমি বড় নীরস মানুষ। এতো সুন্দর ফুল গুলো তুমি...
বসো নীলা।
আব্বু আমার খুব ভাল লাগছে।
তোমার ভাল লাগলেই-তো আমারও ভাল লাগবে মা! নীলা আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে তুমি বাংলোতেই অপেক্ষা করো কেমন?
আব্বু আমাকে নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে?
আজ নয় মা। তাছাড়া আজ অনেক দূরে যাবো তোমার কষ্ট হবে।
বেশ আমি কিন্তু এরপর তোমার সঙ্গে যাবো।
যেও মা, যেও।
আমীর আলী কায়েসী এবার উঠে পড়লেন।
এমন সময় বাবুর্চি এসে বললো স্যার খাবার তৈরি হয়ে গেছে।
আমীর আলী কায়েসী বললো—হাঁ আমি খেয়েই যাবো। টেবিলে খাবার দাও!
বাবুর্চি চলে গেলো।
আমীর আলী এবার কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন—এসো মা এক সঙ্গে খেয়ে নি।
নীলাও পিতার সঙ্গে খাবার টেবিলের পাশে এসে বসলো।
খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে গেলো রিজভী সাহেব।
নীলা তাকে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।
যতক্ষণ গাড়ি দেখা গেলো নীলা গাড়ি বারেন্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো তার আব্বুর চলে যাওয়া গাড়িখানার দিকে।
দৃষ্টির আড়ালে গাড়ি চলে যেতেই এগিয়ে এলো নীলা বাগানের পাশে।
বনহুর তখনও কাজ করছিলো।
নীলা ডাকলো—এই মালী।
বনহুর ফিরে তাকালো—আমাকে ডাকছেন মেম সাহেব।
হাঁ শোন।

বনহুর কাঁচি হাতে এগিয়ে এলো।
নীলা বললো—এই রোদে আর কাজ করতে হবে না।
বনহুর বললো—বাগানে যে অনেক ঘাস রয়েছে।
কাল সকালে আবার করবে।
এখন তা হলে কি করব মেম সাহেব?
এখন তোমার কিছু করতে হবে না। ঐ ওখানে বসো।
চাচা বকবে।
আমি তাকে বলবো তোমাকে ছুটি আমিই দিয়েছি। আচ্ছা রংলাল?
চমকে উঠলো বনহুর তার ছদ্মনামটা এ জানলো কি করে, বললো—মেম সাহেব আমার নাম রংলাল আপনাকে কে বললো?
তোমার চাচা।
ও! বলুন মেম সাহেব?
তোমার বাড়ি কোথায় রংলাল?
বাড়ি?
হাঁ।
অনেক দূরে।
তবু নাম তো আছে।
আছে। আমার বাড়ি ঝিন্দ শহরে।
ঝিন্দ শহরে?
হাঁ মেম সাহেব।
দেশে তোমার কে কে আছে?
বাবা নেই মা আছে। বুড়ো মা।
নীলা আরও কিছু যেন জানতে চায়। মুখখানা তার রাঙা হয়ে উঠে নিজের অজ্ঞাতে।
বনহুর নীলার মুখোভাব লক্ষ্য করে মাথা নিচু করে একটু মৃদু হাসে।
নীলা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না।
বনহুরও কিছু বলে না।
কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।
এমন সময় চাচা এসে পড়ে—রংলাল তোর কাজ হলো?
এবার নীলা বলে উঠলো—আজ থাক, কাল সকালে বাকিটুকু শেষ করবে। দেখছো না বাগানে যা রোদ।
বনহুর বলে—তা হলে এখন যাই মেম সাহেব?

চাচা কোন কথা বলে না কারণ কাজ শেষ না করে গেলে সে দোষী হবে। তা ছাড়া মেম সাহেব আজ এতো নরম হয়েছেন অন্যদিন বাগান পরিষ্কার না হলে কিছুতেই ছুটি মিলতো না।

নীলা বললো—আচ্ছা তোমরা আজ যাও কাল সকালে এসো কিন্তু...

আসবো মেম সাহেব। বললো বনহুর। তারপর লম্বা সেলাম দিয়ে চাচাকে লক্ষ্য করে বললো—চলো চাচা।

বনহুর আর চাচা চলে গেলো।

নীলা দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর বাড়ি ফিরে এলো। আজ তাকে বেশি প্রসন্ন মনে হচ্ছে। খুশি হয়ে চাচীর সঙ্গে কাজে যোগ দিলো সে।

একদিনেই বনহুর চাচীর সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে নিয়েছে। সেই রুক্ষ কড়া মেজাজী চাচী একবারে পাল্টে গেছে যেন। বনহুর বললো—চাচী দাও তোমার ময়দা করার ভারটা আমার উপরে দাও।

চাচী তো বেঁচেই গেলো।

বনহুর চাচীর হাত থেকে কাঠের বলয়টা নিয়ে ময়দা করতে শুরু করলো।

সিমলাই ফিরে এলো সন্ধ্যার কাছাকাছি। একবোঝা কাঠ সে টেনে এনেছে। চাচী রুটি তৈরি করে সবাইকে খেতে দিলো।

আজও চাচার ডিউটি আছে।

রাতে সে বাড়ি থাকবে না।

সিমলাই আর বনহুর রইলো বাড়িতে।

বনহুরকে অবশ্য তাজের সেবা করতে হয় তাই ওর কিছু সময় কাটে তাজের সঙ্গে। তাজকে নিজ হাতে খাওয়ায় এবং গা ডলে দেয় বনহুর।

সিমলাইও করে সময় মত।

রাতে চাচীর গা টিপা একটা দৈনন্দিন কাজ। প্রতিদিনের মত আজ রাতেও চাচীর গা টিপতে বসলো সিমলাই আর বনহুর।

এখন অবশ্য সিমলাই-এর কিছুটা সয়ে উঠেছে। সে সদা-সর্দারের পাশে জড়োসড়ো হয়ে থাকতো। সঙ্কোচ আর দ্বিধা নিয়ে চলাফেরা করতো। সে ভাবটা বনহুর অনেক করে ছাড়িয়েছে।

সিমলাই আজ একা বনে কাঠ কাটিতে গিয়েছিলো তাই বেশি পরিশ্রম হয়েছে ওর। অল্পক্ষণেই সিমলাই হাই তুলতে শুরু করে।

বনহুর হেসে বলে—যাও দোস্ত শুয়ে পড়ো।

সিমলাই প্রতিদিনের মত বিনা বাক্যে শয্যা গ্রহণ করলো।

বনহুর ডাকলো—চাচী চাচী...

চাচী তখন নাক ডাকছে।

বনহুর তবু আরও কিছুক্ষণ ওর গা টিপলো তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে।

দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই জমাট অন্ধকার তাকে অভিনন্দন জানালো।

কক্ষমধ্যে এতোক্ষণ ল্যাম্পের আলোর পাশে চোখ দুটো তার বাঁধিয়ে গিয়েছিলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাকালো সম্মুখে দূরে বহু দূরে পর্বত মালার দিকে।

এক মিনিট দু'মিনিট করে কয়েক মিনিট কেটে গেলো। বনহুর চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখেছে। নেমে এলো নিচে, এগুতে লাগলো দক্ষিণে, তাকালো এবার বনহুর ডাক বাংলোর দিকে।

হঠাৎ দেখলো একটা নীলাভ আলো বিন্দু ডাক বাংলোর সম্মুখে দুলছে। বনহুর চোখে বাইনোকুলার লাগাতেই আলো বিন্দুটা স্পষ্ট নজরে পড়লো। আসলে সেটা আলোর বিন্দু নয় একটা টর্চের আলো দুলছে। মনে হলো কেউ আলোটা দোলাচ্ছে। অন্ধকারেও বনহুরের মুখমণ্ডল দীপ্ত হয়ে উঠলো।

কয়েক মিনিট আলোটা দুললো।

বনহুর মাঝে মাঝে বাইনোকুলারের ফাঁকে চোখটাকে পর্বত মালার দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছিলো। হঠাৎ দৃষ্টি তার এক সময় স্থির হয়ে পড়লো পর্বত শ্রেণীর এক জায়গায়, একটা নীলাভ আলো জলে উঠলো এ আলোটা বেশ বড় এবং গোলাকার।

বনহুর একবার ফিরে দেখে নিলো, ডাক বাংলোর সম্মুখে আলোর বলটা ঠিক পূর্বের মতই দুলছে।

পর্বত মালার আলোটা স্থির হয়ে আছে একবার নিভলো আবার জ্বললো,. আবার নিভলো। বনহুর বাইনোকুলারে চোখ লাগিয়ে দেখছে। আবার জ্বললো। একবার দু'বার তিনবার জ্বললো আর নিভলো। তারপর আলোটা দপ করে নিভে গেলো আর জ্বললো না।

এদিকে ডাক বাংলোর পাশে ও আর সেই আলোর বিন্দুটা নেই। বনহুর অন্ধকারে অট্ট হাসিতে ভেংগে পড়লো। সে হাসির শব্দে নিস্তব্ধ ফিরু গাঁও যেন থর থর করে কেঁপে উঠলো।

ফিরে এলো বনহুর তার শয্যার পাশে।

হঠাৎ চাচী কোঁকিয়ে উঠলো—সিমলাই রংলাল তোরা এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিস আমার হাত পা যে টন টন করছে।

সিমলাই এর তখন নাক ডাকছে।

বনহুর বললো—যাই চাচী।

আয় আমি যে ব্যথায় মরে গেলাম।

বনহুর এসে বসলো চাচীর পা টিপতে। যেমন সে পায়ে হাত দিয়েছে অমনি চাচী বলে উঠলো হারে রংলাল তোর হাত এতো ঠান্ডা কেনোরে?

বনহুর ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললো—হাত দু'খানা কাঁথার বাইরে রেখেছিলাম চাচী তাই।

এবার বনহুর বার বার হাই তুলতে থাকে, কারণ সমস্ত দিন এবং রাতের প্রায় দু'ভাগ সে এতোটুকু বিশ্রাম করেনি। ঘুম পাচ্ছে এখন তার।

❑

নীলা গাড়ি বারেন্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলো পথের দিকে। কারো জন্য যেন সে প্রতিক্ষা করছে বলে মনে হলো। মুখোভাবে অস্থিরতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

আমির আলী কায়েসী জানালার পাশে একটি সোফায় সংবাদপত্র নিয়ে বসেছেন। এখনও চা নাস্তা হয়নি।

বাবুর্চি পাক শালায় সকালের নাস্তা তৈরি নিয়ে ব্যস্ত।

দারোয়ান বাংলোর গেটে রাইফেল কাঁধে পাহারা দিচ্ছে।

অদূরে দেখা গেলো চাচা আর রংলালকে।

নীলার চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো। গাড়ি বারেন্দা থেকে নেমে এগিয়ে গেলো সে গেটের দিকে। ততক্ষণে রংলাল আর চাচা প্রায় গেটের সামনে এসে পড়েছে।

নীলা দারওয়ানকে গেট খুলে দিতে নির্দেশ দিলো।

রংলাল আর চাচা প্রবেশ করলো গেটের মধ্যে।

নীলা বললো—দেরী করলে কেনো তোমরা?

চাচা জবাব দিলো—সমস্ত রাত গাঁও পাহারা দিয়েছি মেম সাহেব। সকালে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বনহুর শুধু একটু হাসলো, কোন কথা সে বললো না।

নীলাও চট করে ওকে কোন প্রশ্ন করে উঠতে পারলো না। একটা লজ্জা তাকে সঙ্কোচিত করে তুললো।

চাচা এবং রংলাল চলে গেলো নিজ নিজ কাজে।

নীলা এবার পিতার কক্ষে প্রবেশ করে ডাকলো আব্বু।

এই যে মা বসো।

আব্বু তুমি আজ বাইরে যাবে না?

হাঁ মা যাবো, আজ তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

উঁ হুঁ আমার শরীর আজ ভাল লাগছে না আব্বু। তুমি আজও বরং একাই যাও কাল আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

শরীর ভাল লাগছে না এটা কেমন কথা মা? কি হলো ডাক্তার ডেকে পাঠাবো কি?

নানা তেমন কিছু না, এমনি মাথাটা একটু ধরেছে।

রাতে বুঝি ঘুম হয়নি?

না।

কেনো মা?

কিছু না আব্বু, তুমি বসো আমি বাগান থেকে ফুল নিয়ে আসি...

আমির আলী সাহেব কিছু বলবার আগে বেরিয়ে যায় নীলা।

বনহুর সবে মাত্র খুরপি হাতে ঘাস পরিষ্কার করতে বসেছে। খানিকটা ঘাস পরিষ্কার করেছে সে এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ায় নীলা। ডাকে—এই রংলাল।

বনহুরের হাতে খুরপি থেমে যায়, ফিরে তাকিয়েই বলে উঠে দাঁড়ায় মেম সাহেব।

আমাকে কিছু ফুল দাও না।

আচ্ছা দিচ্ছি। বনহুর খুরপি রেখে কাঁচি হাতে ফুল কাটতে থাকে।

এগিয়ে যায় নীলা বনহুরের পাশে—রংলাল ফুল তুমি ভালবাসো?

মেম সাহেব আমরা গরিব মানুষ খেতে পাই না, ফুল ভালবেসে কি করবো? ফুল তো আপনাদের জন্য.....

কি—কি বললে রংলাল?

কিছু না মেম সাহেব। নিন ফুল নিন।

দাও। বাঃ খুব সুন্দর ফুলগুলো।

আপনার চেয়ে সুন্দর নয় মেম সাহেব।

কি বললে?

না কিছু না।

বলো—বলো রংলাল কি বললে?

ফুলের চেয়ে আপনি সুন্দর কিনা তাই বললাম।

রংলাল! নীলা অস্ফুট কণ্ঠে বললো। তারপর দ্রুত চলে গেলো নীলা সেখান থেকে।

ততক্ষণে বাবুর্চি টেবিলে চা নাস্তা এনে সাজিয়ে রেখেছে।

নীলা এসে খাবার টেবিলের ফুলদানীতে ফুলগুলো গুজে রেখে বলে উঠলো—আব্বু এসো চা নাস্তা ঠান্ডা হয়ে গেলো।

হাঁ আসছি মা।

আমির আলী সাহেব উঠে এসে চায়ের টেবিলের পাশে বসলেন।

চা নাস্তা খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একটা গাড়ি এসে ঢুকলো ডাক বাংলার গেটের মধ্যে।

গাড়ির শব্দে বনহুর ফিরে তাকালো।

দারওয়ান গেট খুলে সরে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর দেখলো গাড়িখানার পিছন অংশ সম্পূর্ণ বন্ধ কিন্তু ঠিক এম্বুলেন্স গাড়ির মত দেখতে। গাড়ি খানায় ক্রস চিহ্ন দেওয়া আছে। কোন হসপিটালের গাড়ি হবে।

বনহুর কাজের ফাঁকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

গাড়িখানা গিয়ে গাড়িবারেন্দায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

গাড়ির ড্রাইভিং আসন থেকে নেমে পড়লো সাদা চামড়া একটি লোক। লোকটা যে বিদেশী তাতে কোন ভুল নেই।

গাড়িখানা পৌঁছতেই আমির আলী সাহেব চায়ের টেবিল থেকে উঠে পড়লেন। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

বনহুর দেখছে আমির আলী আর সাদা চামড়া লোকটার মধ্যে কি সব কথাবার্তা হলো। সাদা চামড়া লোকটা তার গাড়ির পিছন অংশের দরজা খুলে একটা বাক্স বের করে নামিয়ে রাখলো তারপর দরজা বন্ধ করে পুনরায় গাড়িতে চেপে বসলো।

আমির আলীর নির্দেশে দারওয়ান বাক্সটা তুলে নিয়ে ভিতরে চলে গেলো।

ততক্ষণে গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে।

হাত নাড়ছে আমির আলী।

বনহুর সব লক্ষ্য করলো। দু'চোখে তার বিস্ময় আর জানার বাসনা। যা চেয়েছে হয়তো তারই সন্ধান সে পাবে এখানে।

কয়েক মিনিটেই গাড়িখানা উল্কার মত বেরিয়ে গেলো। বনহুর গাড়ির পিছন অংশে আটকানো গাড়ির নম্বরটা দেখে নিলো। গাড়িখানা কান্দাই এর নয় কারণ ইংরেজিতে তিনটা অক্ষর লেখা আছে এফ্ এন্ এইচ্।

বনহুর অক্ষর তিনটা মনে মনে উচ্চারণ করলো।

গাড়িখানা বিদায় হবার অল্পক্ষণ পর আমির আলী সাহেব তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নীলা তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

গাড়িখানা বেরিয়ে যাবার পর নীলা তার কক্ষে এসে বসলো। একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করলো কিছুক্ষণ। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। গাড়ি বারেন্দায় দাঁড়িয়ে ডাকলো—এই রংলাল?

বনহুর খুরপি রেখে উঠে দাঁড়ালো—আমাকে ডাকছেন মেম সাহেব?
শোন।
রংলাল বেশী বনহুর উঠে এলো গাড়ি বারেন্দায়।
নীলা বললো—শোন রংলাল।
নীলা তার বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলো।
বনহুর নিজের ধূলোমাখা পায়ের দিকে তাকালো একবার তারপর নীলাকে অনুসরণ করলো।
নীলা তার নিজের কক্ষে প্রবেশ করে একটা সোফায় বসে পড়লো।
বনহুর এসে দাঁড়ালো তার পাশে—মেম সাহেব।
নীলা শাড়ীর আঁচল খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললো—জানো রংলাল তোমাকে কেনো ডেকেছি?
না মেম সাহেব জানি না।
রংলাল।
বলুন?
তুমি লেখাপড়া জানো?
না মেম সাহেব লেখাপড়া জানবো কি করে। আমরা গরিব মানুষ.....
গরিব মানুষ হলেই লেখাপড়া শিখতে নাই নাকি?
মানে—অতো টাকা পয়সা পাবো কোথায়.....
তোমার কি লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছা হয়না রংলাল?
হয়।
আমি তোমাকে টাকা পয়সা দেবো লেখাপড়া শিখবে তুমি?
শিখবো কিন্তু.....
আবার কিন্তু কি বলো?
কে আমাকে লেখাপড়া শেখাবে মেম সাহেব?
তাইতো। আচ্ছা রংলাল তুমি শিমলাই-এর সঙ্গে একই...
হাঁ মেম সাহেব একই জায়গায় কাজ করি।
শুনেছি শিমলাই নাকি কোন কারখানায় কাজ করে?
হাঁ আমিও সেই কারখানায় কাজ করি।
কত মাইনে পাও?
শিমলাই যা পায় আমিও তাই পাই মেম সাহেব।
শিমলাই বলেছিলো মাসে নব্বেই পায়।
আমিও তাই পাই?
এই সামান্য টাকায় তোমার সংসার চলে?
অনেক কষ্ট হয়।
এক কাজ করো রংলাল

বলুন মেম সাহেব?
তুমি ও চাকরী ছেড়ে দাও।
তাহলে খাবো কি? আমার বাড়িতে.....
তোমার বাড়িতে এক মা তো?
হাঁ মেম সাহেব।
আর কেউ নেই বুঝি?
বনহুর মাথা চুলকায়—না, মা ছাড়া আর কেউ নেই আমার।
নীলার মুখ খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠে। বলে সে—বিয়ে করোনি বুঝি?
বিয়ে। বিয়ে কে দেবে আমার কাছে মেম সাহেব।
কেনো এতো সুন্দর তুমি.....
একটু হেসে বলে বনহুর—আমি সুন্দর? লোকে বলে আমি নাকি কুৎসিত।
নীলা খিল খিল করে হেসে উঠলো। তারপর বললো—সত্যি রংলাল তোমার মত সুন্দর পুরুষ আমি দেখিনি কোথাও। তুমি যদি ভদ্র লোকের ঘরে জন্মাতে, লেখাপড়া শিখতে.....সত্য তুমি অপূর্ব এক পুরুষ হতে রংলাল। আচ্ছা রংলাল এ চাকরী তুমি ছেড়ে দাও।
কি করবো তাহলে?
আমাদের বাড়িতে অনেক লোকের দরকার। আব্বুকে বলে তোমার চাকরী করে দেবো। জানো রংলাল আব্বুর অনেক টাকা। তোমাকে অনেক টাকা মাইনে দেবো। প্রথমেই তোমাকে দু'শো দেবো বুঝলে? তাছাড়া আমার মা নেই ভাই বোন কেউ নেই শুধু আমি আর আমার আব্বু। তোমাকে আমি নিজে পড়াবো রংলাল।
সত্যি মেম সাহেব?
হাঁ তোমাকে আমি নিয়ে যাবো শহরে। রংলাল লেখাপড়া শিখতে তোমার ইচ্ছা হয়?
হয় কিন্তু এতো বয়সে.....
তাতে কি আছে লেখাপড়া কোনদিন বুড়ো হয় না। তাছাড়া তোমার এমন আর কিই বা বয়স হয়েছে। শোন কাল সকলে আব্বুর সঙ্গে দেখা করবে। আমি আজ আব্বুকে বলে সবঠিক করে রাখবো।
আচ্ছা মেম সাহেব। যাই এবার?
বাগানের কাজ শেষ হয়নি তোমার?
হয়েছে একটু বাকি আছে।
এতো রোদে কাজ করে তোমার খুব কষ্ট হয় না?

কষ্ট। না কষ্ট হয় না। ওসব আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আচ্ছা যাই.....বনহুর বেরিয়ে যায়।

আবার বনহুর বাগানে গিয়ে বসে, আর সামান্য বাকি তাহলেই বাগানের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর এখানে আসবে সে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু এখানে না এলেই নয়। কান্দাই পর্বতমালার সেই নীলাভ আলোর সঙ্গে ডাক বাংলোর মহান ভদ্রলোক আমির আলীর যে সংযোগ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। যাক নীলার দৃষ্টি তাকে আকর্ষণ করেছে এটাই তার সৌভাগ্য তার কাজ উদ্ধারের প্রথম সোপান।

পিতা ফিরে এলে নীলা আব্বাকে বললো এক সময়—আব্বু।

বলো মা?

একটা কথা বলবো রাখবে আব্বু?

রাখবো মা বল?

সত্যি রাখবে তো?

কেনো আমাকে অবিশ্বাস হচ্ছে নাকি মা?

না আব্বু জানি তুমি আমার কথা রাখবে।

বল্ মা বল কি তোর কথা?

রংলাল মালিকে দেখেছো আব্বু?

রংলাল? রংলাল কে?

একটি লোক ডাক বাংলার বাগানে কাজ করে। সিমলাই এর বন্ধু।

বলো?

ছেলেটা বড় গরির।

হাঁ ওরা সবাই গরিব বটে।

আমি বলছিলাম আমাদের তো অনেক লোকের দরকার ওকে আমাদের বাসায় রাখলে কেমন হয়?

হঠাৎ রংলালকে তোর এতো মায়া হলো কেনো মা?

তুমি দেখলে ওকে চাকরী না দিয়ে পারবেনা আব্বু।

তাই নাকি? বেশ আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আনন্দ ধ্বনি করে উঠে নীলা—আব্বু, ও এসে গেছে ডাকবো?

আমিই যাচ্ছি তোকে যেতে হবে না মা।

না আব্বু তুমি বসো আমি ডেকে আনছি.....বেরিয়ে যায় নীলা।

আমির আলী সাহেব তার কন্যাকে এতো আনন্দমুখর হতে দেখেনি কোন দিন। নীলা ধীর শান্ত মেয়ে, সব সময় নিজের ওজন মেপে চলা-ফেরা

করে। অহেতুক কথা-বার্তা সে বলেনা আজ নীলাকে এতো খুশি দেখে আমির আলী সাহেব নিজেও খুশি হন।

একটু পরে রংলাল সহ ফিরে এল নীলা।

আব্বু এই যে রংলাল যার কথা তোমাকে বলেছি।

আমির আলী সাহেব রংলালের পা থেকে মাথা অবধি তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—ও! তারপর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে বললো—শিমলাই এর বন্ধু তুমি?

হাঁ মালিক।

তুমি শহরে যাবে?

বনহুর মাথা চুলকালো।

নীলা বলছে তুমি নাকি শহরে যেতে চাও?

হাঁ যাবো।

বেশ তো তা হলে আমার বাড়িতেই কাজ করবে। কি কাজ পারো তুমি?

সব কাজ পারি মালিক।

বেশ তাহলে তুমি তৈরি থেকো তোমাকে শহরে নিয়ে যাবো। প্রথমে দু'শো করে দেবো পরে মাইনে বাড়িয়ে দেবো বুঝলে?

আচ্ছা মালিক যা আপনাদের দয়া। বনহুর সেলাম করে বেরিয়ে গেলো।

নীলা বললো—ওর খুব উপকার হবে আব্বু।

আমির আলী হেসে বললো—চমৎকার চেহারা। ছোট লোকের মধ্যে এমন চেহারা দেখা যায় না।

আব্বু গরিব হলেই তারা ছোট লোক হয়না। ওরাও মানুষ কাজেই ওদের মধ্যেও মনপ্রাণ সব আছে। তোমার আমার মতই রক্তে মাংসে গড়া ওদের দেহ, কাজেই ওরাও মানুষ।

আমির আলী সাহেবের কন্যার কথায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো—আমি ঠিক ছোট লোক বলিনি মা। বলেছিলাম কি এই সব নিচু ঘরেও এমন ছেলে জন্মে। যাক্ তুমি যখন বলছো ওকে একটা ভাল কাজ দেবো।

আচ্ছা আব্বু।

বনহুর রাতে বাসায় ফিরে চাচা আর সিমলাইকে ডেকে বললো—বড় সাহেব আমাকে একটা চাকরি দেবেন বলেছেন।

চাচা বললো—বড় সাহেব তোকে চাকরি দেবে?

হাঁ চাচা।

সিমলাই এর দু'চোখে বিস্ময় সে কোন কথা বলতে পারেনা, মনে মনে ভাবে সর্দার চাকরি করবে এ কেমন কথা। কিন্তু মুখে সে কিছু বলেনা।

চাচা কিন্তু খুব খুশি হয়ে পড়ে।

চাচী অদূরে কোন একটা কাজ করছিলো কথাটা তার কানে যেতেই রুখে দাঁড়ালো—কিসের চাকরি করবি রংলাল? ও চাকরি করা তো হবে না। তোকে যেতে দেবোনা আমি।

চাচা এবং সিমলাই অবাক চোখে তাকালো চাচীর মুখে। তারা বুঝতে পারলো কেনো চাচী তাকে ছাড়তে চায়না। রংলাল চলে গেলে চাচীর আর ঘুম হবে না কারণ রংলাল নাকি চাচীর গা-টিপতে ভাল পারে।

তবু এক সময় নির্জনে সিমলাই বললো—সর্দার শেষ পর্যন্ত আপনি বড় সাহেবের সঙ্গে শহরে যাবেন চাকরি করতে?

হেসে বললো বনহুর—সিমলাই প্রয়োজনে আমাকে চাকরিও করতে হবে। কিছু ভেবোনা আমি বড় সাহেবের সঙ্গে শহরে গেলে তুমি কান্দাই আস্তানায় চলে যাবে। আমি নিজেও আসবো সময় পেলে।

সর্দার নীলাভ আলোর জন্য এসেছিলেন কিন্তু কই এক দিনও তো চাচাকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করলেন না?

চাচাকে জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন হয়নি তাই করিনি তবে নীলাভ আলোর সন্ধান আমি পেয়েছি সিমলাই।

সর্দার!

হাঁ আমি নিজের চোখে দেখেছি যে নীলাভ আলোর কথা তুমি বলেছিলেন। আরও একটা সংবাদ শোন সিমলাই ঐ নীলাভ আলোর সঙ্গে তোমাদের বড় সাহেবের যোগাযোগ আছে এবং আমি সে কারণেই তার শহরের বাসায় চাকরি গ্রহণ করতে চাই।

সর্দার বড় সাহেব সেই নীলাভ আলোর সঙ্গে....

হাঁ। আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম যা তাই সত্য। সিমলাই তুমি সাবধান থাকবে কোনক্রমে একথা যেন—তোমার চাচা কিংবা চাচী জানতে না পারে।

সর্দার সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।

এমন সময় চাচী এসে পড়ে সেখানে—সিমলাই তুই রংলালকে সর্দার বলিস?

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর জবাব দিল—সিমলাই মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে আমাকে সর্দার বলে চাচী।

বাঃ বাঃ খুব ভাল কথা। যাক অনেকক্ষণ তোরা আরাম করলি এবার কাজে যা।

বনহুর বললো—আজ শরীরটা ভাল লাগছেনা চাচী কাজে যাবোনা।

সে কি বড় সাহেব তোকে চাকরি দেবে আর আজ কাজে যাবিনা?

না চাচী বড় খারাপ লাগছে। আজ সিমলাই যাক। সিমলাই যানা দোস্ত।

আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

আজ সিমলাই রওয়ানা দিলো।

রংলাল এতোক্ষণও এলোনা বড় খারাপ লাগছে নীলার। কেমন যেন বাগানটা আজ খাঁ খাঁ করছে। বাগানের শোভা যেন হারিয়ে গেছে। বড় অশ্বস্তি বোধ করে নীলা।

তার নিজের ঘরে জানালাটা খুলে বসে—তাকিয়ে থাকে বাগানটার দিকে।

সিমলাই এর চাচা যখন এলো তখন নীলা বলেছিলো—রংলাল এলোনা?

চাচা বলেছিলো—বেলা বাড়লে আসবে।

কিন্তু বেলা তো অনেক বাড়লো এতক্ষণ এলোনা রংলাল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলার মনের অস্থিরতা বাড়ছে যেন।

এমন সময় সিমলাই খুরপি হাতে বাগানে প্রবেশ করলো।

নীলা জানালা দিয়ে সিমলাইকে বাগানে প্রবেশ করতে দেখে তার মুখ খানা ম্লান হলো। তাড়াতাড়ি নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে বাগানে প্রবেশ করলো।

সিমলাই নীলাকে দেখে লম্বা সালাম জানালো।

নীলা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—রংলাল এলো না?

সিমলাই বললো—রংলালের শরীর খারাপ করছে তাই আজ আসবে না।

রংলাল আসবেনা?

না মেম সাহেব। তাই আমাকে যে কাজে পাঠিয়েছে।

রংলালের শরীর কেমন খারাপ সিমলাই? জ্বর হয়নি তো?

তা ঠিক বলতে পারলাম না তবে আমার মনে হয় ওর জ্বরই হয়েছে।

কাল কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।

যদি জ্বর থাকে?

তাই তো! আচ্ছা আমিই তাহলে ওকে দেখতে যাবো। নীলা চিন্তিত মনে ফিরে এলো। এবার সে নিজের কক্ষে না গিয়ে পিতার কক্ষে প্রবেশ করলো।

আমির আলী সাহেব বাইরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

নীলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে পিতাকে লক্ষ্য করে বললো—আব্বু রংলালের অসুখ হয়েছে।

তা হবেই মা। মানুষের শরীর কখন কার অসুখ হয়।

আব্বু আমি ওকে দেখতে যাবো।

পাগলি মেয়ে।

কেনো আব্বু?

আমার বাংলোর বাগানে কাজ করে একটা শ্রমিক সেনা আর তুমি হয়ে খান বাহাদুর আমির আলী কায়েসীর মেয়ে। তুমি যাবে তাকে দেখতে?

হাঁ আব্বু।

এতে আমার মান সম্মান খোয়াবে যে মা?

তা কিছু হবে না।

বেশ যেও কিন্তু আজ নয়। কাল দেখো সে আসে কিনা।

আচ্ছা আব্বু। নীলা চলে যায় তার নিজের ঘরে। কিন্তু মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

নীলা পাশের কক্ষে বিষণ্ন মনে পায়চারী করে চলছে। সে নিজেই ভেবে পায় না রংলালের জন্য তার মনটা এতো অস্থির হচ্ছে কেনো। এর আগে আরও কয়েকবার সে তার আব্বুর সঙ্গে এই ফিরু গাঁও এ এসেছে—কিন্তু সে প্রায় এদিকে সেদিকে ঘুরে বেরিয়েছে। বাংলোতে নীলা কম সময়ই থাকতো আর এবার সে বাংলোর বাইরেই যায়নি কিসের আকর্ষণে সে সব সময় বাংলোতেই বসে বসে কাটায়! রংলাল একটা সাধারণ শ্রমিক ছাড়া কিছু নয় কিন্তু...নীলার যেন ওকে শ্রমিক ভাবতে ইচ্ছা হয়না।

সিমলাই সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বললো—সর্দার আজ আপনি যাননি তার জন্য বড় সাহেবের মেয়ে বার বার আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলো। কাল আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে।

বনহুর মনে মনে হাসলো কিন্তু মুখোভাব গম্ভীর করে বললো—শরীরটা এখন আরও খারাপ লাগছে সিমলাই। কাল বুঝি যেতে পারবো না।

সে-কি সর্দার আমি যে মেম সাহেবকে কথা দিয়েছি কাল আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।

বলছি তো অসুখ বেশি হলে যাবো কি করে।

সিমলাই এর পর কোন কথা বলতে সাহসী হলো না।

পরদিন বনহুর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলো।

সিমলাই বললো—দোস্ত যাবি না?

কারণ চাচা চাচী দু'জনাই তখন ঘরে ছিলো।

বনহুর কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিলো— বড্ড জ্বর এসেছে সিমলাই। তুই যা আমার আজ যাওয়া হলো না।

চাচা আর সিমলাই ডাক বাংলোর দিকে পা বাড়ালো।

ওরা চলে যাবার পর বনহুর গা থেকে কম্বল ছুড়ে ফেলে উঠে বসলো—চাচী যেতে দাও কাঠ কাটতে যাবো।

সে-কিরে রংলাল তোর না জ্বর হয়েছে। কাঠ কাটতে যাবি কি করে? চাচীর গলায় দরদ ঝরে পড়ে।

বনহুর বলে—জ্বর ছেড়ে গেছে চাচী।

তবে বাংলোয় গেলিনা কেনো?

চাচী বড় সাহেবের মেয়েটা কেমন যেন কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে । আমার বড্ড ভয় করে।

চাচী রংলালের কথায় হেসে খুন, বলে—বড় সাহেবের মেয়ে তোর দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে?

হাঁ চাচী।

তুই পুরুষ মানুষ তোর আবার ভয় কিরে রংলাল?

কি জানি কোনো যেন ভয় লাগে।

বড্ড বোকা ছেলে তুই। জানিস বড় সাহেবের মেয়ের কত টাকা।

টাকা আছে তো আমার কি চাচী?

তোকে চাকরি দেবে—দু'শো টাকা মাইনে দেবে। এটা কম কথা হলো। আমি বলছি কোন ভয় নেই তোর কাল কিন্তু যেতে হবে তোকে।

কিন্তু চাচী.....

কোন কিন্তু নেই।

আজ কাঠ কাটতে যাবো না?

না। তুই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক বাছা। চাচী এসে বনহুরকে শুইয়ে দিয়ে কম্বল চাপা দেয়।

বনহুর তো হেসেই খুন, সর্বনাশ চাচী জর ছেড়ে গেছে। দেখছো না কেমন গা ঘামছে.....

তুই বললি আর হলো। কম্বল গায়ে একটু ঘুমা আমি নিম পাতা ছেঁচে রস আনি। এক গেলাস নিম পাতার রস খেলে সব অসুখ সেরে যাবে।

চাচী...সব জ্বর ছেড়ে গেছে চাচী। চাচী.....

ততক্ষণে চাচী কাঠের সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো। একটা লম্বা লগ্নি হাতে নিম গাছের ডাল ভাংতে শুরু করে দিয়েছে। রংলালের ডাক তার কানে পৌঁছায় না।

চাচীর কান্ড দেখে বনহুরের চক্ষুস্থির। সে কোন পথে পালাবে ভেবে পায় না। ঘরের কোন থেকে কুড়োলটা তুলে নিয়ে সিড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে তারপর পা টিপে টিপে পালালো।

ওদিকে চাচী নিম পাতা পেড়ে নিয়ে মস্ত এক গেলাস রস তৈরি করে ঘরে যায়—ওরে রংলাল। বাছা রংলাল.....

একি রংলাল কোথায়। শূন্য বিছানা পড়ে আছে। চাচী তাড়াতাড়ি কাঠের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায় তার কানে এখন ভেসে আসে ঘোড়ার খুরের শব্দ। ছুটে আসে চাচী ঘরে যেখানে কুড়োল ছিলো সেখানে কুড়োলটা নেই। এবার চাচী বুঝতে পারে রংলাল বনে কাঠ কাটতে গেছে।

❑

সিমলাই আর চাচাকে দেখে নীলা দড়বড় এগিয়ে আসে। দু'চোখে তার ব্যাকুলতা, ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে—রংলাল এলো না?

জবাব দেয় চাচা—না মেম সাহেব।

কেনো?

তার জ্বর বেশি হয়েছে।

জ্বর বেশি হয়েছে?

হাঁ মেম সাহেব।

নীলার মুখখানা অত্যন্ত ম্লান বিষণ্ন হয়ে পড়ে। তার আব্বুর কক্ষে প্রবেশ করে বলে—আব্বু রংলালের জ্বর বেশি হয়েছে। আজ একটু সময় করে ওকে দেখে আসবো কেমন?

আচ্ছা যাবে যখন তখন যাও।

নীলা খুশি হয়ে বেরিয়ে গেলো। একটু পরে ফিরে এলো আব্বু গাড়ি নিয়ে যাবো?

হাঁ তাই যাও।

নীলা গাড়িতে বসে ডাকলো—সিমলাই তুই আয় আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি।

সিমলাই অগত্যা বাগানের কাজ রেখে এসে দাঁড়ালো গাড়ির পাশে।

নীলা দরজা খুলে বললো—উঠে আয়।

সিমলাই সঙ্কোচিতভাবে গাড়িতে উঠে বসলো।

নীলা নিজে ড্রাইভ করে এগিয়ে যাচ্ছে।

পথ চিনে দিচ্ছে সিমলাই।

আঁকা বাঁকা পাথুরিয়া পথ। কোথাও একটু জল আর ছোট ছোট পাথরের নুড়ি। গাড়িটা একটু আছাড় খেয়ে খেয়ে চলছিলো।

বেশিক্ষণ লাগলো না সিমলাইদের বাড়ি পৌঁছতে।

গাড়ির শব্দ শুনে বেরিয়ে এলো চাচী।

নীলা গাড়ি থেকে নেমে পড়তেই সিমলাই নেমে তার চাচীকে জিজ্ঞাসা করলো—চাচী আমাদের মেম সাহেব। রংলালকে দেখতে এসেছেন।

নীলা বললো—রংলাল কেমন আছে দেখতে এলাম। কোথায় সে?

চাচী তো হতবাক কি জবাব দেবে সে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

সিমলাই বললো—আসুন মেম সাহেব রংলাল ঘরে আছে।

নীলা সিড়ির কাঠে পা রাখতেই চাচী বলে উঠলো—রংলাল কি ঘরে আছে। সে বনে কাঠ কাটতে গেছে। ঐ দেখনা আমি নিম পাতার রস করে রেখেছি এলে খাইয়ে দিবো।

সিমলাই আর নীলা তাকিয়ে দেখলো ও পাশে দাওয়ায় মস্ত এক গেলাস সবুজ রং এর রস রয়েছে। শিউরে উঠলো সিমলাই কারণ সে জানে জ্বর হলে চাচীর কাছে নিস্তার নেই নিম পাতার এক গেলাস রস রোজ সকাল আর সন্ধ্যায় খেতে হবে।

কিন্তু পরক্ষণেই সিমলাই বলে উঠলো—রংলাল কাঠ কাটতে বনে গেছে?

হাঁ।

নীলার মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো, সে বিস্ময় ভরা গলায় বললো—জ্বর নিয়ে রংলাল বনে গেছে কাঠ কাটতে! এরপর আর সে দাঁড়ালোনা। নিজের গাড়িতে উঠে বসলো।

সন্ধ্যার পূর্বেই বনহুর ফিরে এলো বাড়িতে।

সঙ্গে সঙ্গে সিমলাই বলে উঠলো—সর্দার মেম সাহেব এসেছিলো আপনাকে দেখতে।

চাচী বা চাচা তখন ছিলো না তাই সিমলাই সর্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে সসম্মানে কথাগুলো বললো।

বনহুর ঘোড়া থেকে নেমে কাঠের বোঝাটা নামাতে নামাতে বললো—মেম সাহেব! কোন মেম সাহেব সিমলাই?

বড় সাহেবের মেয়ে নীলা।

নীলা এসেছিলো আমাকে দেখতে?

হঠাৎ অট্ট হাসিতে ভেংগে পড়ে বনহুর। এ হাসি সিমলাই এর কাছে অতি পরিচিত। তাই সে নীরবে মাথা নিচু করে থাকে।

সেই দিন গভীর রাতে বনহুর তার পুটলি নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

চাচা আজ ডিউটিতে যায়নি তাই সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে। সিমলাই আর চাচীও ঘুমাচ্ছে।

বনহুর বাইরে এসে পুটলি খুলে পরে নিলো তার দস্যু ড্রেস। অদূরে তাজ দাঁড়িয়ে প্রভূর জন্য অপেক্ষা করছে।

বাংলোর অদূরে এসে বনহুর নেমে দাঁড়ালো। প্রাচীর টপ্‌কে বাংলোর উঠানে প্রবেশ করলো বনহুর।

ওদিকে খান বাহাদুর আমির আলীর কক্ষের আলো জ্বলছে।

বনহুর সন্তর্পনে সেই কক্ষের পাশে এসে দাঁড়ালো। জানালার ফাঁকে নজর পড়তেই দেখলো একটা বাক্সের পাশে দাঁড়ায়ে খান বাহাদুর কি যেন করছে। বাক্সটা ঐ বাক্স, যে বাক্সটা সেদিন সেই অদ্ভুত গাড়িখানা থেকে সাদা চামড়া লোকটা নামিয়ে দিয়েছিলো।

বাক্সটার মধ্যে কি আছে বোঝা গেলনা। তবে বাক্সটার ঢাকনির ফাঁকে নীলাভ আলো দেখা যাচ্ছিলো।

বনহুর শুনতে পেলো একট কণ্ঠ-স্বর, ঐ বাক্সটার পাশে একটা ওয়্যার-লেস ধরনের যন্ত্রও নজরে পড়লো তার।

হঠাৎ আলো নীভে গেলো কক্ষের।

বনহুর আর কোন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবে নীলাভ আলোকরশ্মি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর শুনতে পাচ্ছে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

চমকে উঠলো বনহুর; এই শব্দই সে একদিন তার ট্রান্সমিটার সাউন্ড বক্সে শুনতে পেয়েছিলো। সাংকেতিক কথা-বার্তা, বুঝবার যো নেই।

বনহুর তার ছোট্ট টেপরেকর্ড বের করে চালু করে দিলো। সাংকেতিক কথাগুলো টেপ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কথা বলছে আমির আলী কায়েসী।

বনহুর কথার মানে বুঝতে না পারলেও এটা বুঝলো যার সঙ্গে কথা হচ্ছে আমির আলী সাহেব তাকে অত্যন্ত সমিহ করে চলে। কারণ তার গলার-স্বর অত্যন্ত নরম ছিলো।

মাত্র কয়েক মিনিট কথা হলো।

কক্ষমধ্যে আলো জ্বলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর সরে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেলো সে নীলার কক্ষের পাশে। কক্ষমধ্যে ডিম লাইট জ্বলছে।

বনহুর শার্শী খুলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো। নীলার গলার লকেটে একটি নীল উজ্জ্বল পাথর ঝক ঝক করছিলো। বনহুর মালা ছড়ার লকেটে একটি ছোট কাগজের টুকরো আটকে দিলো তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে।

ভোরে নীলার ঘুম ভাংতেই প্রথমে তার নজরে পড়লো নিজের গলার মালার লকেট। চমকে উঠলো নীলা। এক টুকরো কাগজ আটকানো রয়েছে। কে এই কাগজ তার গলার লকেটে আটকে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলে হাতে নিয়ে মেলে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে, "দস্যু বনহুর। "-নীলা কাগজখানা আবার পড়লো তাতে লেখা আছে—নীলা নিজের মনকে সংযত করো।

—দস্যু বনহুর।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে নীলা, হাতের তালুতে সেই ছোট্ট কাগজের টুকরা। ভাবে নীলা তার এই বদ্ধ ঘরে দস্যু বনহুর এসেছিলো তাহলে। দস্যু বনহুরের নাম সে শুনেছে। আরও শুনেছে তার অসাধ্য কোন কাজ নেই। আব্বুকে এ কাগজ দেখাবে কি? না তা হয়না দস্যু বনহুর তার মনকে সংযত করতে বলেছে। সে কি করে জানলো তার মনের কথা। নীলা যত ভাবছে ততই যেন অস্থির হয়ে পড়ে।

কাগজের টুকরাখানা নীলা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে।

এমন সময় দেখলো রংলাল আর সিমলাই ডাক বাংলোর বাগানে প্রবেশ করছে।

পূর্বাকাশে সোনালী সূর্য সবেমাত্র উঁকি দিয়েছে। জানালার পাশে দুর্বাশিরে শিশির বিন্দুগুলো সোনালী আলো মুক্তোর মত ঝক মক করছে। নীলার মনটা দপ করে খুশিতে ভরে উঠে। ভুলে যায় নীলা একটু আগে সেই ছোট্ট এক লাইন লেখাটার কথা।

নীলা নিজকে সংযত রাখতে পারে না সে বেরিয়ে আসে তার কক্ষ থেকে। গাড়ি বারান্দার সিড়ি বেয়ে নিচে এসে দাঁড়ায়। ডাকে নীলা—রংলাল।

সবেমাত্র কাজে মনোযোগ দিতে যাচ্ছিলো বনহুর, নীলার ডাকে ফিরে তাকায়।

ভোরের সূর্যের আলো নীলার কণ্ঠে নীল পাথরটা দীপ্ত উজ্জ্বল লাগছিলো। বনহুর দেখলো তার সঙ্গে নীলার চোখ দুটোও যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

বনহুর মৃদু হাসলো তারপর একটা সুন্দর গোলাপ তুলে নিয়ে এগিয়ে এলো—নিন।

নীলার মুখে অফুরন্ত খুশি ঝরে পড়ছে, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ফুলটা নিয়ে নাকে ধরলো তারপর বললো—রংলাল তোমার নাকি অসুখ হয়েছিল?

হাঁ মেম সাহেব।

কাল তোমায় দেখতে গিয়েছিলাম.....

আমাকে আপনি দেখতে গিয়েছিলেন মেম সহেব।

হাঁ। কিন্তু তুমি তো ছিলে না। আচ্ছা রংলাল তুমি কেমন লোক বলোতো অসুখ নিয়ে বনে গিয়েছিলে কাঠ কাটতে?

কি করবো, গরিব মানুষ কাঠ না কাটলে খাবো কি?

নীলার চোখ দু'টো ছল ছল করে উঠে। নীলা বলে—রংলাল আমি তো বলেছি তোমাকে চাকরি দেবো।

হাঁ আপনি সে কথা বলেছেন মেম সাহেব।

তাহলে তুমি এখন থেকেই ডাক বাংলোয় থেকে যাও না কেনো?

তা হয় না মেম সাহেব।

তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে?

যাবো কিন্তু যতদিন আপনারা এখানে থাকবেন ততদিন আমি বাড়ি থেকেই কাজ করবো। এবার যাই মেম সাহেব?

আচ্ছা যাও।

রংলাল চলে গেল তার কাজে।

নীলা নিজের কক্ষে এসে জানালার পাশে একটা বই নিয়ে বসলো। ওখান থেকে রংলাল যেখানে কাজ করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।

হঠাৎ রংলালের দৃষ্টি এক সময় চলে যায় জানালাটার দিকে; দেখতে পায় দুটো চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

রংলালের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই নীলা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। আবার তাকায় সে তার হাতের বই খানার দিকে।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে। কাজের ফাঁকে তাকিয়ে দেখে নেয় সে তার শ্রমিক ড্রেসটার দিকে। ঢিলা কুঁচি দেওয়া কাবুলি পাজামা, ঢিলা পাঞ্জাবী, মাথায় গামছা বাঁধা। খালি পা, পায়ে কাদামাটির সঙ্গে একগাদা ঘাসের কুচি লেগে রয়েছে। ভোরের শিশির ভেজা অনেকটা পথ এসেছে সে তাই কাদা আর ঘাস পা দু'খানাকে লেপটে রেখেছে।

আর দু'টো দিন কেটে যায় এমনি করে।

প্রতিদিন আমির আলী সাহেব এ-গ্রাম সে-গ্রাম দেখতে বেরিয়ে যান। প্রজাদের সুখ সাচ্ছন্দ দেখেন এবং খোঁজখবর নেন। অন্যান্য দিনের মত আজও আমির আলী তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নীলাকে অবশ্য যাবার জন্য বললেন আমির আলী। আজও নীলা অস্বীকার করলো।

হেসে গাড়িতে চেপে বসেলেন তিনি।

নীলা পিতাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

গাড়িখানা বেরিয়ে যেতেই নীলা এগিয়ে এলো বাগানের পাশে। ডাকলো—রংলাল।

বনহুর লক্ষ্য করছিলো নীলার কার্যকলাপ।

নীলা ডাকতেই বললো বনহুর—ডাকছেন মেম সাহেব?

হাঁ, শোন।

বনহুর উঠে এলো বাগানের কাজ রেখে।

নীলা বললো—রংলাল, ঐ যে ঝর্ণা দেখছো ওখানে যাবে?

কাজ আছে মেম সাহেব।

থাক্। চলো আমার সঙ্গে।

সিমলাইকে নিয়ে যান.....

না—তুমিই চলো।

অগত্যা বনহুর পা বাড়ালো।

নীলা এগুচ্ছে আগে আগে পিছনে বনহুর।

নীলার পরনে আজও নীল শাড়ি। কানে নীল পাথরের দুল। কপালে নীলাভ টিপ। পায়ে নীল জুতো। ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলো নীলা।

এক সময় বললো নীলা—রংলাল!

বলুন মেম সাহেব।

তুমি লেখাপড়া শিখবে?

হাসলো বনহুর—গরিব দুঃখীদের আবার লেখাপড়া কি মেম সাহেব? শরীর খাটিয়ে যা পয়সা পাই তাই দিয়ে সংসার চলে।

রংলাল, আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাবো।

সত্যি বলছেন?

হাঁ। শিখবে?

শিখবো।

ঝর্ণার পাশে এসে দাঁড়ায় নীলা।

বনহুর একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

নীলা বলে—ভারী সুন্দর।

হাঁ, মেম সাহেব।

বলো তো কি ভারী সুন্দর?

ঐ নীল আকাশ।

নীলা তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। একটু হেসে বললো—নীল আকাশ তোমাকে মুগ্ধ করে রংলাল।

হাঁ, মেম সহেব। ঐ নীল আকাশ আমার খুব ভাললাগে।

আর ঐ ঝর্ণা?

তাও সুন্দর।
রংলাল—সবচেয়ে সুন্দর তুমি।
মেম সাহেব!
হাঁ, রংলাল।
মেম সাহেব আপনি আমাকে সুন্দর বলছেন?
কেনো?
আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে সুন্দর বলেনি, সবাই আমাকে কুৎসিত বলে।
খিল খিল করে হেসে উঠে নীলা—রংলাল, তুমি কুৎসিত?
হাঁ, মেম সাহেব।
আয়নায় নিজের মুখ দেখেছো কোনদিন?
ঘাড় চুলকে বলে বনহুর—আয়না। আয়না কোথায় পাব?
আচ্ছা—আমার ঘরে বড় আয়না আছে, ওতে তুমি নিজের চেহারাটা দেখবে তাহলেই বুঝতে পরবে কত সুন্দর তুমি।
বনহুর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে কোন জবাব দেয় না।
নীলা বলে—রংলাল, তোমার মাকে তুমি খুব ভালবাসো?
খুব ভালবাসী মেম সাহেব। মা ছাড়া আর কাকেই বা ভালবাসবো।
মা ছাড়া আর কাউকে ভালবাসোনি রংলাল?
আবার হাসলো বনহুর—এ অধমের ভালবাসা কে নেবে মেম সাহেব? সামান্য মাইনের চাকরি করি কেইবা আমাকে ভালবাসবে।
রংলাল!
বলুন মেম সাহেব?
না না চলো, এবার বাংলোয় ফিরে যাই?
চলুন।
হঠাৎ নীলার মুখমন্ডল গম্ভীর হলো, বললো—রংলাল, তুমি দস্যু বনহুরকে চেনো?
মুখমণ্ডলে ভীত-ভাব এনে বলে বনহুর—দস্যু বনহুর?
হাঁ।
নাম শুনেছি কিন্তু আজও চোখে দেখিনি মেম সাহেব।
খুব ভয়ঙ্কর দস্যু না?
শুনেছি তাই.....
জানো রংলাল ঐ দস্যু আজ বাংলোয় এসেছিলো?
চমকে উঠলো যেন বনহুর—বলেন কি মেম সাহেব?
হাঁ রংলাল। আমার গলার লকেটে সে একটা চিঠি আটকে রেখে গেছে।
চিঠি! আপনার গলার লকেটে বলেন কি মেম সাহেব?

হাঁ রংলাল। কিন্তু আশ্চর্য সে দস্যু ডাকু অথচ আমার গলায় যে মালাটা রয়েছে এর পাথরের দাম অনেক—অনেক টাকা তবু সে এ মালা ছিড়ে বা খুলে নেয়নি। যেমন এসেছিলো তেমনি চলে গেছে.....

মেম সাহেব আপনি বললেন দস্যু বনহুর নাকি আপনার গলার লকেটে একটা চিঠি আটকে রেখে গেছে?

হাঁ রংলাল।

কি লিখা ছিলো মেম সাহেব তাতে?

ও তুমি বুঝবেনা রংলাল।

হাঁ আমি তো আর লেখাপড়া জানিনা মেম সাহেব। আচ্ছা মেম সাহেব চিঠিখানা বড় সাহেবকে দেখিয়েছেন?

না। ওটা তোমাকেই শুধু বললাম রংলাল।

তাহলে বড় সাহেবেকে চিঠি দেখাননি বা বলেন নি মেম সাহেব?

না দরকার হয়নি।

দস্যু বনহুর আপনার গলার লকেটে চিঠি আটকে রেখে গেলো অথচ আপনি তা বললেন না?

তুমি বুঝবে না রংলাল।

চিঠিটা কি করেছেন?

ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

হঠাৎ বনহুর হেসে উঠলো।

ফিরে তাকালো নীলা ওর মুখের দিকে তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো হাসলে কেন রংলাল?

মাফ করবেন—মেম সাহেব। আমার বড্ড হাসি পেয়েছিলো।

এমন সময় একটা আর্তচিৎকার শোনা যায়।

এক সঙ্গে ফিরে তাকায় বনহুর আর নীলা।

তারা দেখতে পায় একটা বুনো ষাঁড় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে তাড়া করে নিয়ে চলেছে একটা সাঁওতাল যুবককে।

এ দৃশ্য লক্ষ্য করে অনেকগুলো লোক আর্তচীৎকার করছে। কারণ আর একটু হলেই ষাঁড়টা ঐ যুবককে শিং-এর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে। মারা পড়বে যুবকটা, তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যুবকটা উঠি পড়ি করে প্রাণপণে ছুটে আসছে। ষাঁড়টা তার পিছনে তাড়া করে আসছে।

গাঁয়ের লোকগুলো ছুটছে তাদের পিছনে পিছনে।

যুবকটী রংলালকে দেখে সেই দিকে ছুটে আসতে লাগলো।

নীলার মুখ কালো হয়ে উঠেছে। ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।

অতি নিকটে এসে পড়েছে যুবকটা।

ষাঁড়টা সামান্য দূরে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে করে যুবকটির দিকে এগিয়ে গেলো। যুবকটি জড়িয়ে ধরলো বনহুরকে—ভাই রংলাল বাঁচাও.....বাঁচাও.....

ঠিক্ সেই সময় ষাঁড়টা একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

বনহুর যুবকটিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ষাঁড়টার শিং দুটো চেপে ধরলো বলিষ্ঠ হাত দু'খানা দিয়ে। এতো জোরে বনহুর এঁটে ধরলো যার জন্য ষাঁড় মাথাটা উঁচু করতে পারছিলো না। ষাঁড় পিছনে-পা দুখানা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো।

নীলা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। রংলালের সঙ্গে পেরে উঠছে না বলিষ্ঠ ষাঁড়টা।

ততক্ষণে চারিদিকে বহু লোকজন জমে গেছে।

বনহুরের সঙ্গে ষাঁড়টা পেরে উঠলো না।

একজন লোক দড়ি ছুড়ে দিলো—আর দু'জন দু'পাশ থেকে ষাঁড়কে মজবুত করে বেঁধে ফেললো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ষাঁড়টাকে বন্দী করে ফেললো। এবার সবাই বনহুরকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ করতে শুরু করেছে।

অদ্ভুত এ দৃশ্য?

নীলার যেন বিশ্বাসই হচ্ছেনা—রংলাল একটা বুনো ষাঁড়কে এভাবে কাবু করে ফেললো কি করে।

যুবকটি তখনও থর থর করে কাঁপছে।

আর একটু তা হলেই বুনো ষাঁড়টা তার দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করতো। বনহুরের পা জড়িয়ে ধরলো যুবকটা। ভাই তুমি আমাকে বাঁচালে।

অন্যান্য লোকগুলো ষাঁড়টাকে বেঁধে ফেলেছে। সবার চোখে কৃতজ্ঞতা।

বনহুর বললো—চলুন মেম সাহেব।

নীলা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে অভিভূতের মত তাকিয়ে আছে। রংলালের মধ্যে যে এক অদ্ভুত পৌরুষত্ব ভাব দেখতে পেয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যা নেই।

নীলা বললো—চলো।

ফিরে এলো নীলা আর বনহুর।

নীলা কি বলে যে হৃদয়ের আবেগ জানাবে ভেবে পায় না। রংলাল যদি কোন ভদ্র সমাজের মানুষ হতো নীলা তাকে অফুরন্ত ধন্যবাদ জানাতো।

খান বাহাদুর আমির আলী বাংলোয় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নীলা রংলালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। আব্বু—জানো রংলাল আজ কি করেছে?

হেসে বললো আমির আলী—আমি কেমন করে জানবো মা।

নীলা দু'চোখ বিস্ফারিত করে বললো—জানো আব্বু আজ আমি ঝর্ণার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, রংলালকে সঙ্গে নিয়েছিলাম হঠাৎ বিপদ আপদ হয় এজন্য।

খুব ভালই করেছিলে নীলা, বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলে। কারণ এসব জঙ্গলে জায়গায় কখন কি বিপদ আপদ ঘটে কে জানে।

শোন আব্বু—শুনলে তুমিও শিউরে উঠবে।

বল্ মা বল্ শুনি?

নীলা বলে চলে—জানো আব্বু, আমি ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। ঠিক ঐ সময় একটি তীব্র আর্ত চিৎকারে ফিরে তাকাই, দেখতে পাই সেকি ভীষণ আকার একটা বুনো ষাঁড় একটি সাঁওতাল যুবককে তাড়া করে নিয়ে আসছে, তার পিছনে পিছনে একদল লোক ছুটে আসছে কিন্তু কেউ বুনো ষাঁড়টির কবল থেকে সেই যুবকটিকে উদ্ধার করতে সাহসী হচ্ছেনা। আর একটু তা হলেই যুবকটিকে শেষ করে ফেলে আর কি। ষাঁড়টা একেবারে যুবকের কাছাকাছি এসে পড়েছে, যুবকটি তখন দিশেহারার মত আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে।

সর্বনাশ! তারপর? বললেন আমির আলী সাহেব।

নীলা বলে চলে—তারপর যুবকটি একেবারে আমাদের কাছাকাছি এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়টাও। ঠিক ওই মুহূর্তে রংলাল যুবকটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ষাঁড়টার শিং দুটো চেপে ধরলো। আশ্চর্য আব্বু রংলাল ষাঁড়ের শিং দুটো দু'হাতে এমন জোরে চেপে ধরলো যার জন্য ষাঁড়টা একচুল আর নড়তে পারলো না।

সত্যি বলছিস মা?

হাঁ আব্বু।

রংলাল তাহলে অনেক শক্তি রাখে! এমনি তেজদীপ্ত বলিষ্ঠ ছেলে যদি ভদ্রঘরে জন্মাতো তাহলে.....

কেনো ওরা কি মানুষ নয়?

তা বলছিনা। বলছি ভাল ঘরে এমন ছেলে জন্মালে তার দ্বারা সমাজের অনেক কাজ হতো।

আব্বু রংলালও মানুষ। রংলালকে দিয়ে কেনো সমাজের কাজ হবেনা? আমাদের শরীরে যেমন রক্ত মাংস তেমনি রংলালের দেহেও.....

আমি ঠিক তা বলছিনা মা।

জানি তুমি যা বলছো। বেশ ওকে আমি লেখাপড়া শেখাবো। দেখো ও একদিন তোমার আমার মত সভ্য জগতের মানুষ হয় কিনা।

ঐ সময় বনহুর এসে দাঁড়ালো—মেম সাহেব, এই দেখুন আপনার গলার মালাটা বাইরে পড়েছিলো।

বিস্ময়ে তাকালো নীলা এবং সঙ্গে সঙ্গে গলায় হাত দিয়ে বললো—তাইতো!

আমির আলী সাহেবের চোখে মুখেও বিস্ময় ঝড়ে পড়ছে, মালাটা দেখে নয়—মালাটা রংলাল হাতে পেয়েও আত্মসাৎ করেনি, সে দিতে এসেছে। আমির আলী সাহেবের মুখটা দীপ্ত উজ্জল হয়ে উঠলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একশত টাকার দু'খানা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরলেন—নাও, তোমার বিশ্বস্ততার পুরস্কার।

বনহুর নীলার হাতে মালাটা দিয়ে বললো—মালিক, পুরস্কার আমি চাইনা। মালাটা আমি পেয়েছিলাম বলেই দিলাম, এটাই আমার আনন্দ।

বেরিয়ে গেল রংলাল।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলেন আমির আলী সাহেব রংলালের চলে যাওয়া পথের দিকে। কিছুক্ষণ তিনি কথাই বলতে পারলেন না। একটা সামান্য শ্রমিক-এর মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠ মনোভাব তাকে শুধু আশ্চর্যই করলো না মুগ্ধ করলো তাকে।

পরদিন আমির আলী সাহেব শহরে ফেরার জন্য নীলাকে প্রস্তুত হতে বললেন। আরও বললেন তিনি—শোন নীলা, রংলালকে বলবে সে যেন তৈরি হয়ে সকালে চলে আসে।

নীলার দু'চোখে আনন্দ ফুটে উঠে।

রংলাল তাদের সঙ্গে শহরে যাবে এ যেন তার কাছে বড় খুশির কথা। নীলা চলে এলো বাগানে যেখানে বনহুর কাজ করছিলো। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তাই সে দ্রুত হাত চালাচ্ছিলো।

নীলা এসে ডাকলো—রংলাল।

বলুন মেম সাহেব?

কাল সকাল সকাল চলে আসবে কিন্তু। কাল আব্বু শহরে ফিরবেন। আসবে তো?

আসবো।

নীলা খুশি মনে চলে যায়।

গভীর রাত।

নীলার ঘুম আসছেনা। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে। আজ রাতটা কাটলেই তারা শহরের পথে রওয়ানা দেবে। রংলাল যাবে তাদের সঙ্গে । সব-সময় থাকবে সে তার পাশে পাশে। নীলা ওকে লেখাপড়া শেখাবে। ওকে ভদ্র সমাজে ভদ্রভাবে বাঁচার অধিকার দেবে। রংলালের মুখখানা বার বার তার মানস পটে ভেসে উঠছে। ওকে তার কেনো এতো ভাল লাগে। .....

হঠাৎ নীলার চিন্তাধারায় বাধা পড়ে। কে যেন আলগোছে তার ঘরের জানালা পথে মেঝেতে লাফিয়ে নেমে পড়লো।

কক্ষে ডিম লাইট জ্বলছে।

ডিম লাইটের আলোতে নীলা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে একটা জমকালো মূর্তি তার কক্ষের মেঝেতে এসে দাঁড়িয়েছে।

নীলা যেন আড়ষ্ট-হয়ে যায়। শুনেছে দস্যু বনহুরের দেহে জমকালো ড্রেস পরা থাকে। এই তাহলে দস্যু বনহুর। শিউরে উঠে নীলা, ভয় কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠে—কে? কে তুমি?

দস্যু বনহুর!

তুমি—তুমি আবার এসেছো?

হাঁ।

কি চাও তুমি?

কিছু না।

তবে কেন এসেছো?

একটি কথা বলতে। নীলা তোমাকে সাবধান করে দিয়েছি তুমি নিজেকে সংযত করবে কিন্তু তুমি তা করোনি।

আমি ঠিক্ তোমার কথা বুঝতে পারছিনা?

তা পারবে না। কারণ তুমি এখন নিজের কাছে নিজেই পরাজিত। ভেবে দেখো যা করছো তা সভ্য সমাজের জন্য অশোভনীয়।

না না তুমি জানোনা। আমার মন যাকে চায় সেই তো আমার.....

ছিঃ ছিঃ এ তুমি কি বলছো নীলা?

যা সত্যি তাই বলছি। আমি রংলালকে মন প্রাণে.....

—ভালবাসো? এই তো?

হাঁ।

কিন্তু সে একটা শ্রমিক—একটা মজুর মাত্র.....

হোক, সে মানুষ।

নীলা!

তুমি আমার নাম জানলে কি করে?

দস্যু বনহুরের অজানা কিছু নেই।

সত্যি তুমি আশ্চর্য!

কারণ?

তুমি একজন ডাকু—একজন দস্যু তুমি ,তবু তোমার মহান চরিত্রের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তুমি সেদিন রাতে আমার কক্ষে প্রবেশ করেও আমার কোন ক্ষতি করোনি। ইচ্ছা করলে তুমি আমার সবকিছু হরণ করতে পারতে।

কেমন করে জানলে সেদিন তোমায় রেহাই দিয়েছি বলে আজও দেবো?

এবার নীলার বুকটা ধক করে উঠলো। এতোক্ষণ যে সাহস নিয়ে নীলা কথা বলছিলো দপ্ করে সে মনোবল নিভে গেলো। আমতা আমতা করে বললো—যা চাও তাই দেবো, তুমি চলে যাও দস্যু বনহুর।

যদি বলি তোমাকেই চাই—

তা হতে পারেনা। আমি চিৎকার করবো।

আমি তোমার আব্বাকে সব কথা জানিয়ে দেবো। তিনি যদি জানতে পারেন তুমি রংলালকে মনপ্রাণে ভালবাসো তাহলে তার পরিণতি কি হবে জানো? রংলালকে চিরদিনের জন্য তোমার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। কোনদিন আর তার দেখাও পাবেনা.....

না না, তা হয় না। আমি সত্যি করে বলছি ওকে ভালবেসে ফেলেছি। তুমি কেনো—কেনো আমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিতে চাও? বল তুমি কি চাও—কত টাকা চাও, আমি তাই দেবো। আমার এ মালা ছড়া তোমাকে দিচ্ছি, তুমি চলে যাও আর কোনদিন তুমি এসো না। নীলা নিজের গলার মালাছড়া খুলে নিয়ে জমকালো মূর্তির দিকে ছুড়ে দেয়—যাও। যাও দস্যু বনহুর আর তুমি এসো না।

বেশ আমি যাচ্ছি কিন্তু মনে রেখো নীলা তুমি যা করছো, মোটেই তা সমীচীন নয়। জমকালো মূর্তি মালাছড়া পকেটে রেখে যে পথে কক্ষে প্রবেশ করেছিলো সেই পথে বেরিয়ে যায়।

নীলা বিছানার উপরে যেমন বসেছিলো তেমনি বসে থাকে একটি পুতুলের মত।

বার বার নীলার কানের কাছে জমকালো মূর্তির কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়.....বেশ আমি যাচ্ছি কিন্তু মনে রেখো নীলা তুমি যা করছো মোটেই সমীচীন নয়.....

সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটলো নীলার। ভোরে তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। কেমন যেন বিষণ্ন ক্লান্ত লাগছে তাকে। তবু তার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, বারবার তাকাচ্ছে সে জানালা দিয়ে অদূরস্থ পাথুরিয়া পথটার দিকে।

আমির আলী সাহেব একবার এসে বলে গেছেন—মা, তৈরি হয়ে নাও। বেলা দশটার মধ্যেই আমরা রওয়ানা দেবো।

নীলার শরীরটা আজ যেন উঠতেই চাচ্ছেনা। বাবুর্চি এসে বলে গেলো—আপামনি, টেবিলে চা নাস্তা দেওয়া হয়েছে।

তবু নীলার গ্রাহ্য নেই।

শেষ পর্যন্ত খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব নিজে এসে ডাকলেন—মা নীলা, এসো চা ঠান্ডা হয়ে গেলো যে।

আসছি আব্বু।

পিতার সঙ্গে চা নাস্তার টেবিলে এসে বসলো নীলা।

আমির আলী সাহেব কন্যার প্লেটে দু'খানা পরোটা উঠিয়ে দিতেই নীলা বলে উঠলো—না আব্বু একখানা দাও।

কেনো মা আজ অমন করছিস কেনো?

খিদে নেই আব্বু।

আচ্ছা নীলা চোখ দুটো তোর বড্ড লাল হয়ে উঠেছে। রাতে বুঝি ঘুম হয়নি?

না আব্বু ও কিছু না। অনেক ঘুমিয়েছি। খেতে খেতে জবাব দিলো নীলা।

আমির আলী সাহেব কন্যার জন্য একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি পুনরায় বললেন—শরীর খারাপ করেনি তো মা?

না আব্বু। তুমি খাও, আমার কিছু হয়নি। ঠিক ঐ মুহূর্তে জানালা পথে অদূরে রংলালকে দেখা যায়। চাচা আর সিমলাই তার সঙ্গে এসেছে।

নীলার মুখখানা দীপ্ত উজ্জল হয়ে উঠে, বলে সে—আব্বু রংলাল এসে গেছে।

হাঁ মা, আমি ওর কথাই মনে করছিলাম। ছেলাটা সত্যিই বড় ভাল। যেমন সাহসী শক্তিশালী তেমনি বিশ্বাসী।

আব্বু তোমার ওকে ভাল লাগে?

হাঁ মা। তাছাড়া সে শুধু সেদিন ঐ সাঁওতাল যুবকটিরই জীবন রক্ষা করেনি, তোকেও সে বাঁচিয়েছে কারণ যুবকটিকে আহত করে তোকেও আক্রমণ করতো ষাঁড়টা তাতে কোনো ভুল নাই।

ঠিক বলেছো আব্বু। সেদিন ও না থাকলে কি যে হতো কে জানে। আব্বু তুমি খাও আমার খাওয়া হয়ে গেছে। নীলা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে।

আমির আলী সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বলেন—সে কি মা কিচ্ছু খেলে না তো?

অনেক খেয়েছি আব্বু। বেরিয়ে যায় নীলা।

বাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়ায় নীলা, হাত নেড়ে ডাকে—রংলাল এদিকে এসো। সিমলাই এর চাচা সিমলাই তোমরাও এসো।

সবাই ওরা এসে দাঁড়ালো বাংলোর বারান্দার পাশে। সালাম জানালো তারা নীলাকে।

নীলা বললো—রংলাল তুমি তৈরি তো?

হাঁ মেম সাহেব। একটু হেসে জবাব দিলো বনহুর।

নীলার কাছে ওর হাসিটা বড় ভাল লাগে। চোখ দুটো যেন ফিরিয়ে নিতে পারে না! তবু দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হয়! রংলাল ভাববে কি।

খান বাহাদুর সাহেব চুরুট ঠোঁটে বেরিয়ে আসেন।

নীলা বলে—আব্বু ও এসেছে। চলো এবার আমরা রওয়ানা দি।

হাঁ মা চলো। কিহে রংলাল যাবেতো আমাদের সঙ্গে?

যাবো মালিক। বললো বনহুর।

চাচা বললো—মালিক কোনদিন শহরে যায়নি একটু দেখবেন।

তোকে আর বলতে হবেনা। হেসে বললেন আমির আলী সাহেব।

বাবুর্চি তার জিনিসপত্র গাড়িতে উঠিয়ে নিলো।

আমির আলী সাহেব বললেন—এবার তোমরা সবাই গাড়িতে চেপে বসো। ড্রাইভ আসনে চেপে বসলেন তিনি।

এবার ফিরু ডাক বাংলা থেকে বিদায় নিলো ওরা।

চাচা এবং সিমলাই দাঁড়িয়ে রইলো।

সিমলাই-এর সঙ্গে বনহুরের সব কথা হয়ে গেছে। তাজকে নিয়ে ফিরে যাবে সে কান্দাই।

অবশ্য ক'দিনের মধ্যেই বনহুর কান্দাই তার আস্তানায় আসবে বলে দিয়েছে।

গাড়িখানা চলে গেলো—চাচা এবং সিমলাই ফিরে চললো বাড়ির পথে।

❑

রংলালকে নিয়ে নীলার অপূর্ব এক অনুভূতি। নীলা যেন ওকে সর্বক্ষণ নাগপাশের মত ঘিরে থাকতে চায়। ওকে যতই দেখে ততই যেন সে মুগ্ধ বিস্মিত হয়।

শহরে আসার পর বনহুরও বেশি হাবা বনে যায়। এত বড় বাড়ি এতো ঐশ্বর্য্য সে যেন দেখেনি কোনদিন। অবাক হয় এসব দেখে।

নীলা বলে—রংলাল আজ তোমার বই কিনে এনেছি তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে।

বনহুর খুশি হয়ে, মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায় সে লেখাপড়া শিখবে।

এক সময় বলে নীলা—রংলাল তোমার জন্য পাজামা পাঞ্জাবী তৈরি করে দেবো। পরবে তো?

পরবো।

নীলা সেই দিনই তাদের নিজস্ব দর্জ্জিকে ডেকে বনহুরের জন্য ভাল দামী কাপড়ের পাজামা আর পাঞ্জাবী তৈরির অর্ডার দিলো।

পরদিনই এসে পড়লো অর্ডারের পাজামা আর পাঞ্জাবী। নীলা বনহুরের নিজের হাতে পাঞ্জাবী পরিয়ে দিয়ে বললো—বাঃ কি সুন্দর লাগছে। যাও এবার পাশের ঘরে গিয়ে পাজামা পরে এসো।

বনহুর পাজামা হাতে চলে গেলো পাশের ঘরে।

নীলা ওর জন্য প্রতিক্ষা করতে লাগলো।

পাজামা পাঞ্জাবী পরে অপূর্ব সুন্দর মানিয়েছে বনহুরকে। নীলা সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনা ওর দিক থেকে।

বনহুরও কিন্তু অবাক চোখে নীলার মুখে তাকিয়ে থাকে। ওর দৃষ্টির কাছে নীলার চোখ দুটো নত হয়ে আসে আপনা আপনি। বেরিয়ে যায় সে নিজের ঘরে।

হাসে বনহুর। নীলার সরল সহজ মনের কাছে নিজকে অপরাধী বলে মনে হয়। নীলা তাকে মনপ্রাণে ভাল বেসে ফেলেছে। সেই ভালবাসার বিনিময়ে তার সঙ্গে তাকে করতে হচ্ছে ছলনা। কিন্তু সে যে নিরুপায়। এ ছাড়া খান বাহাদুর আমির আলীর সঙ্গলাভের আশা কম। আমীর আলী সাহেব যে এই হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই কান্দাই পর্বত মালার সেই নিলাভ আলোর সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমির আলীর। শুধু নিলাভ আলোকরশ্মিই নয় এ হত্যা রহস্যের মূল ঘাটি তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

সন্ধ্যার পূর্বে বনহুর বাগানে পানি দিচ্ছিলো।

নীলা যেয়ে দাঁড়ালো তার পাশে—রংলাল।

বলুন মেম সাহেব?

আজ থেকে তুমি আর বাগানে কাজ করবে না।

সেকি মেম সাহেব?

হাঁ আমাদের পুরোন মালিই সব করবে।

আমি তাহলে কি করবো?

যা করতে হয় আমিই বলে দেবো।

এমন সময় আমির আলী সাহেব এসে দাঁড়ালেন হেসে বললেন তিনি—রংলাল তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। নীলা মা তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে।

বনহুর মাথা নিচু করে রইলো।

নীলা বললো—আব্বু ওর পাজামা পাঞ্জাবী করে দিয়েছি।

হাঁ দেখ্ছি ভারী সুন্দর হয়েছে। বললেন আমির আলী সাহেব। তারপর চলে গেলেন তিনি নিজের কক্ষে।

নীলা বললো—চলো এখন পড়বে চলো।

আচ্ছা বলুন মেম সাহেব।

মেম সাহেব নয়—আপামনি বলবে।

মাথা কাৎ করে সম্মতি জানালো—আচ্ছা বলবো।

নীলার পিছু পিছু এগোয় বনহুর।

হল ঘর পেরিয়ে একটি সুসজ্জিত ঘর। এই ঘরে এসে দাঁড়ালো নীলা।

বনহুর তখনও পর্দার ওপারে দাঁড়িয়েছিলো।

নীলা ডাকলো—রংলাল ভিতরে এসো।

বনহুর অতি সঙ্কোচিতভাবে পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

নীলা বললো—বসো।

বনহুর তো অবাক, সে কি করে মেম সাহেবের সামনে চেয়ারে বসবে। দাঁড়িয়ে থাকে রংলাল।

নীলা পুনরায় বলে—বসো। এই চেয়ারখানায় বসো।

বনহুর নীলার পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড়ে।

নীলা চেয়ারে বসে বই মেলে ধরে—এই নাও পড়ো।

বনহুর খুশিতে উচ্ছল হয়ে বইখানা নীলার হাত থেকে নিয়ে মেঝের কার্পেটে মেলে ধরে।

নীলা উবু হয়ে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—বলো অ, আ, ই, ঈ...

বনহুর নীলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলো উচ্চারণ করে চলে।

বাঃ চমৎকার হচ্ছে। বললো নীলা।

বনহুর বললো—আজ এই পর্যন্ত থাক মেম সাহেব?

আবার মেম সাহেব। বলো আপামনি।

আপামনি আজ.....

আর পড়বেনা এই তো?

হাঁ।

কাল কিন্তু পুরো এক ঘন্টা পড়তে হবে।

আচ্ছা আপামনি।

রংলাল?

বলুন?

পড়া-শোনা ভাল লাগে?

খুব।

রোজ সকাল আর সন্ধ্যায় আমি তোমাকে পড়াবো।

আচ্ছা। বনহুর বই হাতে উঠে দাঁড়ালো।

রংলাল তুমি এ কামরাতেই ঘুমাবে। আব্বু বলেছে তোমার জন্য এ কামরা ছেড়ে দেওয়া হলো।

বনহুর তবু দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছিলো।

নীলা বললো—তুমি যাচ্ছো কোথায়? আজ থেকে এ ঘর তোমার। আমি যাচ্ছি.....

নীলা বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বেরিয়ে যায়।

বনহুর ওর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে।

এবার বনহুর কক্ষটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বড় লোকের রুচীসম্মত সাজানো ঘরখানা। এক পাশে একটা খাট। খাটে স্প্রিং এর গদির উপরে ভেলভেটের বিছানা। নরম তুলতুলে এক জোড়া বালিশ। বালিশে মূল্যবান কভার। চাদরে বুটি তোলা ভেলভেটের ফুল। খাটের পাশে একটা টেবিল, টেবিলে একটা ফুলদানি। ফুলদানিতে সদ্য রাখা এক থোকা গোলাপ। পাশে দু'খানা চেয়ার। মেঝেতে কার্পেট বিছানো রয়েছে। দেয়ালে কোন ছবি নেই, শুধু একটা দেয়াল ঘড়ি টিক্ টিক্ করে বেজে চলেছে।

বনহুর বিছানায় না শুয়ে মেঝেতে কার্পেটে শুয়ে হাতখানা মাথার নিচে রাখলো। ভাবছে অনেক কথা। কখন যে নিজের অজ্ঞাতে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নাই বনহুরের।

হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেলো কিন্তু চোখ মেললো না সে। কেউ যেন তার মাথার নিচে বালিশ গুঁজে দিচ্ছে। অতি সন্তর্পনে বালিশ দিয়ে আবার চাদর এনে আলগোছে বিছিয়ে দিলো তার সারা দেহের উপর।

বনহুর চোখ মেলে দেখলো নীলা।

আরামে চোখ দুটো মুদে আসছে একটু নড়লো না সে ইচ্ছা করেই। যেমন নিঃশব্দে নীলা তার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো।

❑

রাত যখন তিনটা।

সমস্ত কান্দাই শহর ঘুমে অচেতন।

বনহুর তার শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। নিঃশব্দে প্রবেশ করলো সিড়ি ঘরের নিচে ছোট্ট ঘরখানায়। একটু পরে বেরিয়ে এলো তার শরীরে জমকালো ড্রেস। মাথার পাগড়ীর নিচের অংশ দিয়ে বনহুরের মুখের নিচের অংশ ঢাকা। কোমরের বেল্টে পিস্তল এবং এক পাশে ছোরা। পায়ে বুট।

অতি সন্তর্পনে পিছন পাইপ বেয়ে উঠে গেলো উপরে। যে কক্ষে আমির আলী সাহেব অঘোরে ঘুমাচ্ছেন সেই কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর জানালার শার্শী খুলে।

বুটের শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেল আমির আলী সাহেবের। চোখ রগড়ে তাকাতেই শিউরে উঠলেন তিনি। কম্পিত কণ্ঠে বললেন—কে?

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে আমির আলীর শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো। দক্ষিণ হস্তে তার উদ্যত রিভলভার।

বনহুর সম্মুখস্থ চেয়ারে একখানা পা তুলে দাঁড়ালো গম্ভীরকণ্ঠে বললো—আমি—যম!

যম।

হাঁ। খান বাহাদুর সাহেব আপনার কাজ কতদূর হলো জানতে এসেছি।

কাজ! কিসের কাজ?

রক্ত আর চক্ষু পাচার ব্যবসায় কতদূর অগ্রসর হয়েছেন?

এ সব তুমি কি বলছো? কে তুমি?

আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন।

না। না আমি ওসব কিছু জানি না।

তা হলে মরতে চান? আমার হতে এটা কি জানেন? একটুও শব্দ হবে না অথচ আপনার রক্তাক্ত দেহটা পড়ে থাকবে আপনার দুগ্ধ ফেনিল শয্যার উপরে। আপনার মৃত্যুর পর আপনার একমাত্র আদরিনী কন্যার অবস্থার কথা স্মরণ করে আমার কাছে সব কথা খুলে বলুন।

না না আমি কিচ্ছু জানি না।

আমির আলী সাহেব আপনি জানেন না?

না।

ডাঃ রায় আমার হাত থেকে নিস্তার পায়নি খান বাহাদুর সাহেব আপনিও পাবেন না...

ডাঃ রায় এর কথায় খান বাহাদুর আমির আলী সাহেবের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। আমতা আমতা করে বললো—ডাঃ রায়। কে ডাঃ রায়—আমি—আমি তাকে চিনি না।

এবার বনহুর হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে তারপর বললো—আপনি চেনেন না ডাঃ রায়কে? যার জন্য আপনাদের ঘাটিগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে? যার জন্য আপনাদের ব্যবসা অচল হবার পথে? ডাঃ রায়কে আমিই পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।

তুমি—তুমি দস্যু বনহুর?

এতোক্ষণে তা হলে চিনতে পেরেছেন? খান বাহাদুর সাহেব ডাঃ রায়কে হত্যা না করলেও আপনাকে আমি ক্ষমা করবো না। তবে আপনি যদি আপনাদের ঘাটির সন্ধান আমাকে জানান তাহলে...

ঠিক এই মুহূর্তে টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো সশব্দে।

বনহুর তাকালো ফোনটার দিকে।

খান বাহাদুর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বনহুর তার পূর্বে নিজেই তুলে নিলো রিসিভারটা।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো একটা গুরুগম্ভীর গলা...আগামী অমাবস্যা রাত তিনটায় জঙ্গলবাড়ি ঘাটিতে আসবে...জরুরি দরকার আছে...ডাঃ রায় কাঠ গড়ায় উঠার পূর্বে তাকে...পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে...খান সাহেব...। বনহুর এবার রিসিভারটা খান বাহাদুর সাহেবের মুখের কাছে ধরে বলে—বলুন হ্যালো, বলুন।

এবার খান বাহাদুর আমির আলী কম্পিত কণ্ঠে বললেন—হ্যালো হ্যালো—বলুন—

পরক্ষণেই রিসিভার বনহুর নিজের কানে চেপে ধরলো।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো অমাবস্যার দিন ভোর রাতেই তুমি রওয়ানা দেবে...হাঁ আরও একটি কথা মনে রাখবে আমির আলী। নীলাকে সঙ্গে আনবে—নীলাকে তুমি যেদিন আমার হাতে তুলে দেবে...মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার একথা—খান বাহাদুর..খান বাহাদুর.....

বনহুর রিসিভারটা দ্রুত হস্তে পুনরায় আমির আলীর মুখের কাছে তুলে ধরলো—বলুন আছে। বলুন আছে....

আমির আলী তখন ঘেমে নেয়ে উঠেছেন, তিনি বললেন—আছে ...আছে...

সরিয়ে নিলো আবার রিসিভার খানা বনহুর আমির আলীর মুখের কাছ থেকে তারপর কানে রেখে শুনতে চেষ্টা করলো। ওদিকের সেই গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর—নীলা তোমার মেয়ে নয় তবু আমার হাতে তাকে তুলে দিতে

তোমার এতো দ্বিধা কেনো জানি না...বয়স আমার হয়েছে তাই বলে নীলা সুখী হবে না একথা তুমি ভেবো না আমির আলী...নীলাকে একবার কোনক্রমে কৌশলে আমার হতে তুলে দাও আমি যেমন করে হোক তাকে বাগিয়ে নেবো...হাঁ সব কথার শেষ কথা তুমি আগামী অমাবস্যার রাত তিনটায় জঙ্গলবাড়ি ঘাটিতে নীলা সহ আমার সঙ্গে দেখা করবে...বনহুর আবার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রিসিভারখানা আমির আলীর মুখে চেপে ধরলো—বলুন আচ্ছা, বলনু...

আমির আলী বললেন—আচ্ছা...

এরপর বনহুর তার রিসিভার কানে দিয়েই টেবিলে রাখলো কারণ ও পাশের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

এবার বনহুর তার পিস্তল আমির আলী সাহেবের বুকে চেপে ধরে বললো—আমি কয়েকটা প্রশ্ন করবো সঠিক জবাব দেবেন, না হলে মৃত্যু অনিবার্য। দেখুন প্রাণের চেয়ে এ পৃথিবীতে কোনটাই প্রিয় নয়। যতক্ষণ বেঁচে থাকবেন ততক্ষণ লাভ তারপর সব কিছু মূল্যহীন। খান বাহাদুর আমার এক নম্বর প্রশ্ন হলো নীলা কার মেয়ে? বলুন জবাব দিন?

আমির আলী সাহেবের মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি কোন জবাব না দিয়ে বনহুরের চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বনহুর বললো—ভয় নেই আমির আলী সাহেব—নীলা আমার বন্ধু ডাঃ রায় এর মেয়ে...

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—নীলা ডাঃ রায়-এর কন্যা।

হাঁ। নীলা ডাঃ রায়-এর কন্যা হলেও আমি তার পিতার মত। শিশুকালে ডাঃ রায় নীলাকে আমার হাতে সমর্পণ করেছেন।

কারণ—?

নীলার জন্ম রহস্যময়—।

নীলার জন্ম রহস্যময় সে কেমন?

অনেক কথা আছে।

বেশি কথা শোনার সময় আমার নেই সংক্ষেপে বলুন। আর সত্য কথা বলবেন এক বর্ণ কিছু মিথ্যা বললে আপনার রক্তাক্ত দেহটা বিছানায় লুটিয়ে পড়বে। আমির আলী সাহেব নীলার জন্ম কাহিনী শোনার পূর্বে আমি আমার অন্য প্রশ্নের জবাব শুনতে চাই। বলুন জঙ্গল বাড়ি কে আছে, যে একটু পূর্বে আপনার নীলাকে পাওয়ার জন্য আগ্রহশীল?

আমি—জানিনা.....

আবার মিথ্যা কথা? বনহুর তার পিস্তল খানা আমির আলী সাহেবের বুকে চেপে ধরে।

আঁতকে উঠে আমির আলী সাহেব, জীবনে তিনি এমন বিপদে পড়েননি। এতোদিন তিনি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে শুনেই এসেছিলেন আজ তাঁকে একেবারে স্বচক্ষে দেখলেন শুধু তাই নয় জবাবদিহি করতে হচ্ছে তার প্রশ্নের। দস্যু বনহুর তাকে এই দন্ডে হত্যাও করতে পারে। মৃত্যুকে আমির আলী সাহেব বড় ভয় করেন। এবার তিনি না বলে পারলেননা, বললেন—তুমি যার কণ্ঠ একটু পূর্বে শুনলে তিনি আমাদের দলপতি!

নাম কি তার?

নাম—নাম.....

হাঁ বলুন তার নাম কি?

নাম ডক্টর হামবার্ট চাটার্জি।

হামবার্ট চাটার্জি?

হাঁ।

বাঙ্গালীর নাম—হামবার্ট মানে?

আসলে তিনি বাঙ্গালীও নয় অবাঙ্গালীও নয় তিনি বিদেশী, ভাল বাঙ্গলা জানেন.....

থামলেন কেনো বলুন?

না না আমি এর বেশি বলতে পারবোনা।

বলতে হবে। দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর।

আমির আলী সাহেব বললেন—কান্দাই পর্বতমালায় জঙ্গলবাড়ি নামে আমাদের একটা ঘাঁটি আছে.....

হাঁ আমি জানি। বলনু?

সেখানেই থাকেন হামবার্ট।

বুঝলাম।

নীলাকে তিনি বিয়ে করতে চান.....

হাঁ শুনলাম। খান বাহাদুর সাহেব আগামী অমাবস্যায় জঙ্গল বাড়ি নীলাসহ আপনার আমন্ত্রণ আছে। কাজেই আপনি তৈরি থাকবেন। আমি ঐ দিন ফিরুগাঁও ডাক বাংলোয় আপনার সঙ্গে মিলিত হবো। কিন্তু মনে রাখবেন আপনি যদি এ কথা কোনক্রমে কাউকে জানান তাহলে দস্যু বনহুর আপনাকে ক্ষমা করবেনা। হাঁ এবার বলুন নীলার জন্ম কাহিনী?

কিন্তু.....

হাত ঘড়ি দেখে নেয় বনহুর—আর কয়েক মিনিট আমি এ কক্ষে অপেক্ষা করবো, বলুন?

কিন্তু নীলা যদি জানতে পারেন এসব কথা?

হাসলো বনহুর—নীলা আজ না জানলেও একদিন জানবে খান বাহাদুর সাহেব। তার জন্ম কাহিনী—আপনি কোনক্রমে গোপন রাখতে পারবেন না তার কাছে।

নীলা জন্ম গ্রহণ করার পরক্ষণেই ডাঃ রায় নীলার জননীকে হত্যা করেছিলো।

হত্যা করেছিলো ডাঃ রায় নীলার মাকে?

হাঁ।

ডাঃ রায় তাহলে স্ত্রীর হত্যাকারী?

না। নীলার মা তার স্ত্রী নয়।

নীলার মা ডাঃ রায়ের স্ত্রী নয়?

না।

তাহলে আপনি বললেন নীলা ডাঃ রায়-এর কন্যা?

হাঁ। নীলা ডাঃ রায় এর কন্যা।

তবে?

নীলার মা একটি মজুরের অবিবাহিতা কন্যা.....

ও এবার বুঝেছি।

তারপর নীলাকে গোপনে ডাঃ রায় আমাকে দিয়ে দেন তার সঙ্গে দেন একটি নীল বহু মূল্যবান পাথর। যে নীল বিক্রয় করে আমি আজ খান বাহাদুর আমির আলী। আজ আমি কোটি কোটি টাকার মালিক। নীলাই আমার সৌভাগ্য। না না নীলাকে আমি কোনদিন দূরে সরাতে পারবোনা। ও আমার মেয়ের চেয়েও বড় বেশি আদরের। ওকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত বাঁচতে পারবোনা। নীলা আমার জীবন.....

ঐ মুহূর্তে বাইরে কারো পদশব্দ শোনা যায়।

বনহুর বলে উঠে—আমির আলী সাহেব মনে রাখবেন এর একটি কথা প্রকাশ পেলে আপনার মৃত্যু—কথা শেষ করে বেরিয়ে যায় বনহুর।

পিছন পাইপ বেয়ে সে নেমে আসে নিচে।

পাহারাদার প্রতি রাতেই দুই একবার খান বাহাদুর আমির আলী সাহেবের কক্ষের বারান্দায় ঘুরে যায়—কারণ কোন শত্রু যেন প্রবেশ করতে না পারে।

ভোরে নীলাই প্রথম পিতার কক্ষে প্রবেশ করে।

আমির আলী সাহেব যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছেন। তিনি কক্ষের মেঝেতে একটি সোফায় স্থির হয়ে বসে আছেন। আজ তার চোখ দু'টো লালে লাল হয়ে উঠেছে। নীলা কক্ষে প্রবেশ করে বললো—আব্বু তুমি আজ বাগানে যাওনি?

না মা।

কেনো আব্বু? প্রশ্ন করে নীলা।

খান বাহাদুর সাহেবের একটা অভ্যাস আছে তিনি ভোরে শয্যা ত্যাগ করেই সর্বপ্রথম বাগানে যান। কিছুক্ষণ বাগানের মুক্ত বাতাসে পায়চারী করেন তারপর ফিরে এসে চা-নাস্তা পান করেন।

আজ যেন এসবের ব্যতিক্রম।

নীলা তাই অবাক হয়ে পিতার কক্ষে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলো।

জবাব দিলেন আমির আলী সাহেব—আজ শরীরটা বড় ভাল নেই মা।

সেকি আব্বু শরীরটা আবার খারাপ হলো? দেখি জ্বর হয়নি তো? নীলা আমির আলীর মাথায় কপালে হাত রাখে।

আমির আলী সাহেবের মনে তখন প্রচন্ড ঝড় বয়ে চলেছে। রাতের সেই দৃশ্যটা এখনও ভাসছে তাঁর চোখের সামনে। সেই জমকালো মূর্তি। সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। সেই তেজোদীপ্ত উজ্জল দৃষ্টি চোখ।

নীলা পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়, তার আব্বুকে সে এমন হতভম্ব নির্বাক হতে দেখেনি কোনদিন। বলে নীলা—কি ভাবছো আব্বু? মাথা তো বেশ ঠান্ডা বলে মনে হচ্ছে?

হাঁ মা জ্বর নেই।

তবে ঘরে চুপ করে বসে আছো কেনো?

কিছু না।

এমন সময় রংলাল বেড-টি সহ সংবাদপত্র নিয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করে—মালিক বেড-টি।

নীলা বলে উঠে—রংলাল, বয় কোথায়?

আপামনি বয়ের অসুখ তাই.....রংলাল টেবিলে চায়ের কাপ এবং টি পট্ গুলো নামিয়ে রাখে।

নীলা চা তৈরি করে পিতার হাতে দেয়।

রংলাল সংবাদ পত্র খানা টেবিলের পাশে ভাঁজ করে রাখে, তারপর বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

নীলা বলে—রংলাল আমার ঘরে এক কাপ চা দিও।

আচ্ছা আপামনি। বেরিয়ে যায় রংলাল।

নীলা এবার নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে। একখানা বই নিয়ে মেলে ধরে চোখের সম্মুখে।

একটু পরে রংলাল ট্রের উপর চায়ের-কাপ সহ প্রবেশ করে।

পদশব্দ শুনেও নীলা চোখ তোলেনা।

রংলাল নীলার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়। একটু কেশে বলে—আপামনি চা।

নীলা গম্ভীর কণ্ঠে বলে—টেবিলে রাখো।

রংলাল টেবিলে চায়ের-কাপ রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

নীলা ডাকে—শোন।

রংলাল থমেকে দাঁড়ায়—আমায় ডাকছেন আপামনি?

হাঁ শোন।

এগিয়ে আসে রংলাল।

নীলা তাকায় ওর চোখের দিকে—তোমাকে বলেছি বয়-এর কাজ বা মালির কাজ তুমি আর করবে না।

তাহলে কি করবো?

আব্বুর সঙ্গে তার গবেষণাগারে কাজ করবে।

গবেষণাগার?

হাঁ সেখানে তুমি থাকবে আব্বু বলেছেন।

গবেষণাগার কেমন আপামনি? বাগানের মত সুন্দর বুঝি?

তুমি বড্ড বোকা রংলাল। না তোমার নামটা পাল্টাতে হবে। রংলাল বড় বিশ্রি নাম কিন্তু.....আচ্ছা তোমাকে যদি মনির বলে ডাকি?

রংলাল যেন চমকে উঠলো তারপর বললো—যা আপনার ভাললাগে তাই বলে ডাকবেন।

আজ থেকে তোমাকে মনির বলে ডাকবো। এ নামটা আমার খুব পছন্দ। আচ্ছা মনির?

বলুন আপামনি?

তুমি এরি মধ্যে একটি বই শেষ করে ফেলেছো। আগামী সপ্তাহে তোমাকে আরও একটি নতুন বই এনে দেবো। আচ্ছা মনির?

বলুন?

তুমি গাড়ি চালানো শিখবে?

শিখবো কিন্তু কে আমাকে শেখাবে?

আমি তোমাকে গাড়ি চালানো শেখাবো। তুমি আমার গাড়ির চালক মানে ড্রাইভার হবে।

খুব-ভাল হবে আপামনি।

কাল থেকে আমি তোমাকে জাহাঙ্গীর মাঠে নিয়ে যাবো। সেখানে বিরাট মাঠ দু'চার দিনেই তুমি গাড়ি চালানো শিখবে।

❑

বনহুরের পাশে বসে নীলা গাড়ি চালানো শেখায়। এমনি করে হ্যান্ডেল ধরতে হয়, এমনি করে ব্রেক করতে হয়। বনহুরের ইচ্ছা না থাকলেও তাকে বাধ্য হয়ে গাড়ি চালানো শেখার অভিনয় করতে হয়। নীলার কোমল হাতের ছোয়া বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় শিহরণ জাগায়। ভাল লাগে কোমল কণ্ঠের ধমকগুলো—তুমি বড্ড বোকা এতো করে বলছি এমনি করে হ্যান্ডেল ধরতে হয়...নাও ধরো.....

নীলা বনহুরের হাত দু'খানা সহ গাড়ির হ্যান্ডেল চেপে ধরলো।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

খুশি হয় নীলা—বাঃ বাঃ চমৎকার।

আজ আর নয় আপামনি আবার কাল হবে।

মনির?

বলুন?

গাড়ি চালাতে তোমার কেমন লাগছে?

খুব ভাল।

সত্যি?

হাঁ আপামনি।

নীলা বলে—থাক তাহলে আজ, কাল সকালে আবার হবে।

তাই থাক আপামনি। বলে বনহুর।

বাসায় ফিরে নিজের হাতে বনহুরকে সাজিয়ে দেয় নীলা। আজ পাজামা পাঞ্জাবী নয় আজ সুট প্যান্ট টাই। নিজের হাতে নীলা টাই বেঁধে দেয় ওর গলায়।

নিস্পলক-নয়নে তাকিয়ে থাকে নীলা বনহুরের দিকে।

বনহুর বলে—আপামনি আমার বড্ড লজ্জা করছে।

লজ্জা! কেনো?

এসব পোশাক পরে আমি বাইরে যাবোনা কিন্তু।

ও এই লজ্জা?

হাঁ আপামনি?।

বাইরে তোমার যেতে হবেনা শুধু আমি তোমায় দেখবো। আর সেজন্যই আমি এ পোশাক নিয়ে এসেছি।

নীলা! হঠাৎ বনহুরের মুখ দিয়ে শব্দটা উচ্চারণ হয়ে পড়ে।

মুহূর্তে নীলার চোখ দু'টো দীপ্ত উজ্জল হয়ে উঠে। ওর কোটের সম্মুখ ভাগ চেপে ধরে বললো—ডাকো আর একবার নীলা বলে ডাকো.....

মাফ্ করবেন আপামনি.....আমি—আমি ভুল করে.....

না তুমি আমাকে এখন থেকে নীলা বলেই ডাকবে।

না না তা হয়না আমি একজন.....

তোমাকে আমি আমার মনের মত করে গড়িয়ে নেবো মনির।

তা হয়না আপামনি। আমি মূর্খ, আমি গরিব আমি একজন শ্রমিক.....

তুমি একজন মানুষ এই তো তোমার আসল পরিচয়। আমি তোমাকে ভালবাসি মনির।

আপামনি.....

নীলা ওর মুখে হাত-চাপা দেয়—না না তুমি আমাকে নীলা বলে ডাকো। অপূর্ব তোমার কণ্ঠ-মনির!

নীলা দু'হাতে বনহুরের হাত দু'খানা চেপে ধরে ব্যাকুল গলায় বলে—বলো কোনদিন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবেনা? বলো জবাব দাও মনির?

বনহুর হতবাক হয়ে যায়, সে জানতো এমনি একটা অবস্থা একদিন আসবে এজন্যই সে রাতের অন্ধকারে নিজ মূর্তি ধারণ করে নীলাকে সাবধান করে দিয়েছে তবু তাকে সংযত করা সম্ভব হলোনা। কি জবাব দিবে বনহুর ভেবে পায়না। এজন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না তখন।

নীলা বলে—চুপ করে আছো কেনো মনির? বলো!

আমার মা আছে তার কাছে আমার যেতে হবে। .....

তোমার মাকে আমি আমাদের এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবো। তবু তুমি কথা দাও আমাকে ছেড়ে যাবেনা কোনদিন?

বেশ যাবো না। বনহুর কোট খুলে ফেললো, টাইটাও খুলে রাখলো তারপর চলে গলো পাশের কক্ষে। যখন সে বেরিয়ে এলো তখন তার দেহে পাজামা আর পাঞ্জাবী শোভা পাচ্ছে।

নীলা বললো—যাও বাগানে কাজ করোগে।

বনহুর বুঝতে পারলো নীলা তার আচরণে খুশি হয়নি। মাথানিচু করে বেরিয়ে গেলো বনহুর।

বাগানে এসে ফুল গাছগুলোর গোড়া পরিষ্কার করতে শুরু করলো বনহুর।

নীলা কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর বুঝতেই পারেনি।

নীলা ডাকলো—মনির?

বনহুর তখন অন্য কোন চিন্তায় বিভোর ছিলো। নীলার কণ্ঠস্বর তার কাছে ঠিক মনিরার কণ্ঠ বলে মনে হলো। চমকে ফিরে তাকালো তুমি। না না আপামনি আপনি.....

মনির আবার তুমি বাগানের কাজে এসেছো?
আপনি তো বললেন আপামনি?
উঠে এসো। উঠো বলছি.....
বনহুর বাধ্য ছাত্রের মত মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়ালো।
নীলা বললো—এসো।
বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।
নীলা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো, ড্রাইভ আসনের পাশের দরজা খুলে ধরে বললো—উঠো।
বনহুর যন্ত্র চালিতের মত নীলার আদেশ পালন করলো।
এবার নীলা ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।
নীলার হাতে গাড়িখানা তীরবেগে ছুটতে লাগলো।
বনহুর পাশে বসে আছে স্থির হয়ে। চুলগুলো তার এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে ললাটের চার পাশে। পাঞ্জাবীর বোতাম খোলা থাকায় তার লোমভরা প্রশস্ত বুকের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিলো। পা দু'খানা সম্পূর্ণ খালি কোন জুতো ছিলোনা।
নীলাও নিশ্চুপ গাড়ি চালিয়ে চলেছে। দৃষ্টি-তার সম্মুখে।
এক সময় বললো নীলা—বোবা বনে গেছো নাকি?
এ্যাঁ!
চমকে উঠলে যে?
বলুন আপামনি?
কি ভাবছো অমন করে?
এ্যাঁ?
কি ভাবছিলে সঠিক জবাব দেবে?
আপনার কথা ভাবছিলাম।
নীলা ফিরে তাকায়—আমার কথা তুমি ভাবছিলে?
হাঁ আপামনি।
কি ভাবছিলে?
ভাবছিলাম আপনি আমাকে কত ভালবাসেন।
কেনো তুমি আমাকে ভালবাসোনা মনির?
আমি—আমি হাঁ বাসি.....
সত্যি এটা তোমার মনের কথা?
আমি তো জানিনা।
সঙ্গে সঙ্গে-ব্রেক কসে গাড়ি থামিয়ে ফেলে নীলা, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে—তুমি জানোনা?

উঁ হুঁ.....জানিনা।

মনির!

তখন গাড়িখানা এক নির্জন স্থানে এসে পড়েছিলো। পথের দু'পাশে বিস্তৃত প্রান্তর আর গমের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা আর ঝর্ণা ধারা।

নীলা নেমে পড়ে গাড়ি থেকে, অভিমানে এগিয়ে যায় সে গমের ক্ষেতের পাশ ধরে।

বনহুর মৃদু হাসে, অগত্যা সেও নেমে যায় গাড়ি থেকে। নীলা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে কিছুদূর। বনহুর তার পিছনে না এগিয়ে একটা উচু টিলার উপর বসে পড়ে।

নীলা দূর থেকে একবার ফিরে তাকালো সেও বসে পড়লো একটা গাছের নিচে। অভিমানে নীলার দু'চোখে পানি এসে যাচ্ছিলো। ওর একটি কথা তাকে বড় আঘাত দিয়েছে আমি তো জানিনা.....রংলাল তাকে এমন কথা বলতে পারলো!

নীলা অনেকক্ষণ বসে বসে প্রতিক্ষা করলো। আসলে রংলাল কিন্তু সে এলো না। নীলা উঠে এলো তার পাশে—মনির।

সরল সহজভাবে বনহুর উঠে দাঁড়ালো—আপামনি।

এসো যাই।

আপামনি এরি মধ্যে বেড়ানো হলো?

তোমাকে আর কোন দিন সঙ্গে আনবোনা।

কেনো?

এসো...নীলা এগিয়ে যায় গাড়িখানার দিকে।

বনহুর ওকে অনুসরণ করে।

গাড়িতে বসে আর কোন কথা হয় না তাদের মধ্যে।

আজ নীলাকে সর্বক্ষণের জন্য বিষণ্ন মনে হয়। গাড়ি থেকে নেমে নিজের ঘরে চলে গেলো সে।

সন্ধ্যা বেলা অন্যান্য দিনের মত বই নিয়ে হাজির হলো বনহুর নীলার ঘরে।

পদ শব্দে চোখ তুলে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিলো নীলা।

বনহুর বুঝতে পারলো তার উপর নীলা অভিমান করেছে তাই মাথা নীচু করে একটু হাসলো তারপর সহজ গলায় বললো—আপামনি আজ পড়া বলে দেবেন না?

গম্ভীর কণ্ঠে বললো নীলা—না।

বনহুর ধীর পদক্ষেপে দরজার দিকে পা বাড়ালো নীলার অভিমানের কারণ সে জানে তাই তার মনে কোন রাগ হয়নি।

পিছু ডাকলো নীলা—শোন।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর।

নীলা বললো—এদিকে এসো।

বনহুর এসে দাঁড়ালো নীলার সম্মুখে—আপামনি বললেন যে পড়াবেন না আর।

হাঁ। তুমি চলে যাও, আর তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

বনহুর চমকে চোখ তুললো—চলে যাবো?

হাঁ আজ এই সন্ধ্যাবেলা এক্ষুণি চলে যাও।

আচ্ছা। বনহুর নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

নিজের ঘরে এসে মনে মনে হাসলো বনহুর। নীলার উপর বড় মায়া হলো, সরল সহজ মন একটি তরুণী। জানেনা—কাকে সে ভালবেসেছে। নিজের জামা কাপড়গুলো তার সুটকেসটার মধ্যে গুছিয়ে নিচ্ছিলো বনহুর।

এমন সময় কে যেন তার কাঁধে হাত রাখলো।

বনহুর ফিরে তাকালো।

নীলা তার কাঁধ থেকে হাতখানা সরিয়ে নিলো। দু'চোখে তার পানি ছল ছল করছে। ডাকলো সে—মনির তুমি সত্যি চলে যাচ্ছো?

হাঁ আপামনি।

কেনো—কেনো তুমি যাচ্ছো?

আপনি তো আমাকে যেতে বললেন।

না তোমার যাওয়া হবেনা।

সেকি আপামনি আপনি যে বললেন?

আমি বলছি তোমার যাওয়া হবেনা। এসো বই নিয়ে পড়বে এসো।

বনহুর মাথা নিচু করে একটু হাসে। অবশ্য সে হাসি নীলার নজরে পড়ে না।

নীলা বলে—এসো মনির।

এবার বনহুর বই হাতে তুলে নেয়।

নীলার পিছনে পিছনে এগিয়ে চলে বনহুর।

প্রতিদিনের মত নীলা চেয়ারে বসে আর বনহুর বসে তার পায়ের কাছে। বইখানা মেঝেতে মেলে বসে।

নীলা ওকে পড়া বলে দেয়।

বনহুর আজ সুন্দর করে পড়া উচ্চারণ করে।

নীলা খুশি হয়ে বলে যে—কাল এ বইখানা তোমার শেষ হলে তোমাকে একটা জিনিস পুরস্কার দেবো।

বনহুর খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠলো—আচ্ছা আপামনি আজ তাহলে ঘরে বসে পড়া মুখস্থ করিগে?

আচ্ছা যাও।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

রাত বাড়ছে।

নীলা একটা বই পড়ছিলো।

বাবুর্চি টেবিলে খাবার দিয়ে বলে গেলো—আপামনি খাবার দিয়েছি।

আচ্ছা যাচ্ছি। নীলা বই রেখে সোজা হয়ে বললো বাবুর্চি—

বলুন আপামনি?

রংলাল খেয়েছে?

তার ঘরে খাবার দিয়েছি।

আচ্ছা যাও আসছি.....

বাবুর্চি চলে যায়।

নীলা উঠে পড়ে, এগিয়ে যায় সে বনহুরের কক্ষের দিকে।

বনহুর সবেমাত্র খাবার খেতে শুরু করেছে।

এমন সময় নীলা এসে দাঁড়ায় পাশে—একি আবার তুমি হাত দিয়ে খাচ্ছ? কাঁটা চামচ হাতে নাও।

আপামনি আমি কাঁটা চামচে খেতে পারিনা।

হাতে নাও আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি.....

বনহুর কাঁটা চামচ হাতে তুলে নেয়।

নীলা ওর পিছনে থেকে হাত দু'খানা ধরে দেখিয়ে দেয়—নাও এমনি করে খাও। খাও.....

পারছিনা আপামনি।

পারবে। নিশ্চয়ই পারবে.....নাও ধরো।

নীলা এমনি করে বনহুরকে কাঁটা চামচে খাওয়া শেখাতে থাকে।

বনহুরের খাওয়া শেষ হলে নীলা খেতে যায়।

বনহুর আপন মনে হাসে।

রাত-গভীর হয়ে আসছে।

নীলার মনে এক নতুন অনুভূতি। অভূতপূর্ব শিহরণ জাগে তার শিরায় শিরায়। এতো ভালো লাগে ওকে.....নীলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে ওর কথা।

মৃদু টোকা পড়ে দরজায়।

নীলার বুকটা আনন্দে টিপ টিপ করে উঠে। নিশ্চয়ই রংলাল এসেছে হয়তো কোন কথা বলতে। নীলা দরজা খুলে দিতেই জমদূতের মত জমকালো পোশাক পরা একজন প্রবেশ করলো নীলার পাশ কেটে কক্ষের ভিতরে।

নীলা কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলো, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তার মুখমন্ডল।

জমকালো মূর্তি বললো—ভয় নেই আমি তোমার কোন ক্ষতি করবোনা। কারণ তোমার গলার হার ছড়া তুমি আমাকে দিয়েছো। নীলা একটা কথা তোমাকে জানাতে এলাম। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী।

নীলা অস্ফুট কণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুর তুমি আমার মহামূল্যবান হীরক হার নিয়েছো আবার তুমি কেনো এলে?

বলেছি তোমার মঙ্গল্লের জন্যই এসেছি যেহেতু তুমি আমাকে উপযুক্ত উপহার দিয়েছো। শোন নীলা তুমি মহা ভুল করছো। রংলালকে তুমি যেভাবে নিজের করে নিতে চেষ্টা করছো তা কোনদিন মঙ্গলজনক নয়। আমি বার বার তোমাকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি.....

নীলার চোখে মুখে ভয় আর আতঙ্ক ছাড়াও একটা ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠলো, সে বললো—আমি এ ব্যাপারে কারো পরামর্শ চাইনা। আমি রংলালকে শুধু নিজের করে নিতেই চাইনা তাকে আমি নিজের করে নিয়েছি। কোনদিন তাকে আমি ছেড়ে দেবোনা। দস্যু বনহুর তুমি আরও যা চাইবে তাই দেবো তবু আমাকে তুমি এ ব্যাপারে সাবধান করতে এসোনা।

নীলা তুমি যদি ওকে ত্যাগ না করো তাহলে আমি ওকে হত্যা করবো। ওকে চিরদিনের জন্য তোমার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলবো।

দস্যু! তুমি এতোবড় পাষন্ড! এতোবড় হৃদয়হীন। আমাকে দুঃখ ব্যথা দেওয়ার জন্য তুমি একটা নিষ্পাপ জীবন বিনষ্ট করতে চাও? কি অপরাধ আমি করেছি বলো? তাই ওকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও? আমি তোমাকে ভয় করিনা, তুমি ওকে হত্যা করার পূর্বে আমাকে হত্যা করবে.....নীলার দু'চোখে পানি ঝরে পড়ে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে।

স্তব্ধ আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বনহুর। নীলার মুখখানা তার হৃদয়ে দারুনভাবে আঘাত করে। নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে বনহুর।

নীলা ছুটে যায়, দু'হাতে বনহুরের পা দু'খানা চেপে ধরে বলে—তুমি যা চাও আমি তাই দেবো দস্যু বনহুর। আমি তাই দেবো তবু রংলালকে তুমি হত্যা করোনা। ওর কোন দোষ নেই। কোন অপরাধ নেই—আমি তোমার পা ধরছি।

পা ছাড়ো নীলা।

না শপথ করো আমার রংলালকে তুমি হত্যা করবেনা? বলো কথা দাও।

হেসে উঠে বনহুর—দস্যুর আবার শপথ।

আমি বিশ্বাস করবো তোমার কথা।

নীলা।

হাঁ।

কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কেনো। কেনো সম্ভব নয়?

পরে সব তুমি জানতে পারবে নীলা। তুমি রংলালকে ত্যাগ করো।

পারবোনা। বার বার তুমি আমাকে এ অনুরোধ করোনা দস্যু বনহুর। তোমাকে মহামূল্যবান হার দিয়েছি এই নাও আমার হাতের বলয় জোড়া তুমি নাও তবু আমার রংলালকে ছিনিয়ে নিওনা...

কিন্তু তুমি ভুল করছো নীলা।

নাও তবু তুমি যাও। যাও দস্যু বনহুর.....

বনহুর নীলার হাত-থেকে বলয় জেড়ো নিয়ে পকেটে রাখলো। তারপর বললো—বেশ আমি যাচ্ছি আবার দেখা হবে।

বেরিয়ে গেলো বনহুর।

নীলার শরীর যেন হীম ঠান্ডা হয়ে উঠেছে। তার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে।

বনহুর বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিট পর নীলা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে অতি সন্তর্পণে সিড়ি বেয়ে নেমে আসে নিচে। রংলালের কক্ষে প্রবেশ করে এগিয়ে যায় সে—তার বিছানার দিকে। আলগোছে সরিয়ে ফেলে নীলা তার মুখের কম্বল খানা।

অঘোরে ঘুমাচ্ছে রংলাল।

কক্ষের নীলাভ আলোয় রংলালের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো নীলা নিষ্পলক নয়নে। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোটা ফোটা অশ্রু.....

পরবর্তী বই

জঙ্গল বাড়ি ঘাটি

জঙ্গল বাড়ি ঘাটি-৬৪

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

পরদিন নীলাকে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবাপন্ন মনে হচ্ছিলো। তার নিজের ঘরে একটি চেয়ারে বসে ভাবছিলো গতরাতের ঘটনা। দস্যু বনহুরের কথাগুলো তার কানের কাছে প্রতিধ্বনি হচ্ছিলো।

হঠাৎ নীলা চিৎকার করে উঠে—না না আমি তোমাকে ভয় করি না দস্যু বনহুর! আমি তোমাকে ভয় করিনা.....

বেডটি হাতে সেই মুহূর্তে রংলাল এসে দাঁড়ায়—আপামনি দস্যু বনহুর! কোথায় কোথায় সে?

রংলাল তুমি!

হাঁ আপামনি আপনার বেডটি।

রংলাল.....নীলা উদ্ভ্রান্তের মত তাকায় ওর মুখের দিকে। এলোমেলো চুল, ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল চোখ দুটে ফ্যাল ফ্যাল করছে যেন!

বললো রংলাল—আপামনি আজ আপনার কি হয়েছে?

কিছুনা।

দস্যু বনহুর এসেছিলো বুঝি?

হাঁ-হাঁ রংলাল।

সত্যি বলছেন আপামনি?

মাথা দোলায় নীলা—হাঁ।

কই কোথায় সে? কোথায় সে আপামনি?

রাতে সে আমার ঘরে এসেছিল।

দস্যু বনহুর আপনার ঘরে এসেছিলো বলেন কি আপামনি।

হাঁ আপনি কি বলছেন আপামনি?

সব সত্য রংলাল! সব সত্য.....না না সে কোন কথা কাউকে বলতে মানা করেছে।

আপনি আমাকে বলুন আপামনি সে একটুও জানতে পারবে না।

তুমি তাকে জানোনা রংলাল। দস্যু বনহুর অতি ভয়ঙ্কর মানুষ? যার অসাধ্য কিছু নেই।

তাহলে আপনি কি আপনার রত্ন তাকে দিয়ে দিবেন আপামনি?

না না আমি পারবো না। রংলাল.....হঠাৎ নীলা ওর বুকে ঝাপিয়ে পড়ে।

একি করছেন আপামনি?

নীলা ওর বুকে মুখ গুঁজে বলে—রংলাল দস্যু বনহুর তোমাকে হত্যা করতে চায়।

আমাকে দস্যু বনহুর হত্যা করতে চায়।

হাঁ রংলাল। তোমাকে ছিনিয়ে নিতে চায় সে আমার কাছ থেকে।

আমাকে হত্যা করে যদি সে আপনাকে রেহাই দেয় মানে আপনাকে মুক্তি দেয়, তাহলে আমি হাসিমুখে তার কাছে নিজকে সমর্পন করবো।.....

তা হয় না। তুমি—তুমি জানো না মনির তুমি আমার স্বপ্ন আমার রত্ন.....

আপামনি.....

নীলা ছুটে বেরিয়ে যায় তার ঘর থেকে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বনহুর। বিরাট এক সমস্যা তার সম্মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। নীলার সরল সহজ মনকে কি করে সে ফাঁকি দিয়ে চলেছে। নিজের কাছে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয় বনহুরের।

ধীরে ধীরে ফিরে আসে বনহুর নিজের কামরায়।

আজ তার ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা ফুটে উঠে না। একটা দুর্বলতা তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মুক্ত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বনহুর ভেবেছিলো কান্দাই হত্যা রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে তাকে এতোদূর গড়াতে হলো সে তো চায় নি এমন একটা কিছু হোক। প্রথম যেদিন বনহুর বাগানে কাজ করছিলো তখন নীলাকে গাড়িতে দেখেই কেমন যেন চমকে উঠছিলো। তার চিন্তাধারা গিয়েছিলো এলোমেলো হয়ে। তার জীবনে যদিও এমন সমস্যা বহুবার এসেছে তবু সেদিন কেনো যেন বড় অস্বস্তি বোধ করছিলো মনে মনে। তারপর সত্যি নীলা এলো তার পাশে যা সে ভেবেছিলে প্রথম নজরেই সেই সমস্যা নিয়ে। নিজকে সে কিছুতেই নীলার কাছ থেকে গোপন রাখতে পারলো না। নীলা তাকে প্রথম দৃষ্টিতেই.....

বনহুরের চিন্তা জাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

কে যেন তার পিঠে মাথা রেখেছে, নিজের মনেই বনহুর ভেবেছিলো নীলা ছাড়া কেউ নয়। মাথাটা ফেরাতেই তার ভাবটা সঠিক হলো, সত্যিই নীলা দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে। শুনতে পেলো ওর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর মনির।

বলুন আপামনি?

চলো দূরে কোথাও যাই!

আপামনি আপনি কাঁদছেন? ফিরে দাঁড়ালো বনহুর নীলার দিকে মুখ করে।

নীলার রক্তাক্ত গণ্ড আরো রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুরের বুকের মধ্যে কেমন অসহ্য একট ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠে, নীলার চোখের অশ্রু তাকে চঞ্চল করে তোলে। হাতখানা এগিয়ে যায় নীলার চোখের পানি মুছিয়ে দেবার জন্য কিন্তু নিজকে সংযত করলেন।

নীলা আঁচলে চোখের পানি মুছে বলে—মনির আমাকে কোথাও নিয়ে চলো। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে পারছি না।

সে কি আপামনি?

হাঁ মনির। আমি দূরে কোথাও যেতে চাই? চলো আমাকে নিয়ে চলো।

আচ্ছা চলুন।

নীলা নিজকে স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করে।

বনহুর তাকিয়ে থাকে ওর অশ্রুসিক্ত মুখ খানার দিকে। আজও নীলার শরীরে ফিকা নীলাভ শাড়ী ব্লাউজ। কানে নীল পাথরের দুটো বল। পায়েও নীল রং-এর জুতো। ভারী সুন্দর লাগছে নীলাকে।

নীলা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতেই বনহুর বললো—আপামনি আপনি পাশে বসুন আমি ড্রাইভ করছি।

তুমি!

হাঁ আপামনি আপনি আমায় ক'দিন ধরে শেখালে.....কথাটা বলে বনহুর ড্রাইভিং আসনে উঠে বসলেন।

নীলা ও উঠে বসলো তার পাশে।

বনহুর গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

নীলার দু'চোখে বিস্ময়। রংলাল এরি মধ্যে এতো সুন্দর গাড়ি চালানো শিখে ফেলেছে। ভুলে গেলো নীলা সব দুঃখ ব্যথা, ভুলে গেলো রাতে দস্যু বনহুরের সেই কঠিন কথাগুলো।

বললো নীলা—মনির সত্যি তুমি অপূর্ব।

সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো বনহুর—সবই তো আপনার দান আপামনি।

মনির আমি ভাবতেও পারিনি তুমি এতো তাড়াতাড়ি এমন সুন্দর গাড়ি চালানো শিখতে পারবে। মনির তুমি অদ্ভুত মানুষ.....

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ফেরাবার জন্য বনহুর বলে—এখন কোথায় যাবো?

নীলা বলে উঠলো—আজ তোমার খুশিমত আমাকে নিয়ে চলো যেখানে তোমার মনচায়।

বনহুর বললো—আপামনি লেকের ধারে যাবো?

আচ্ছা তাই চলো।

বনহুর গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

নীলা নির্নিমেশ নয়নে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। তার দু'চোখে বিস্ময়, এতো অল্প সময়ে এতো সুন্দর দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালিয়ে চলেছে রংলাল এ যেন তার কাছে এক বিস্ময়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্জন লেকের ধারে পৌঁছে গেলো তাদের গাড়িখানা।

বনহুর ড্রাইভ আসন থেকে নেমে নীলার পাশের দরজা খুলে ধরলো।

নীলা নেমে পড়লো গাড়ি থেকে।

নীলা যখন গাড়িতে চড়ে বসেছিলো তখন তাকে অত্যন্ত মলিন বিষণ্ন লাগছিলো আর এখন তাকে বেশ প্রফুল্ল মনে হচ্ছিল।

হেসে বললো নীলা—মনির তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

একটু হাসলো বনহুর।

নীলা এগিয়ে চললো।

বনহুর ওকে অনুরসণ করলো।

লেকের ধারে এসে দাঁড়ালো নীলা। সুন্দর লেকের পানিতে কতকগুলো ছেলেমেয়ে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে খেলা করছিলো।

শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকগণও আসেন। বড়রা লেকের ধারে বসে গল্পসল্প করেন আর ছোটরা লেকের মধ্যে নৌকা চেপে খেলা করে।

নীলা একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো বনহুর দাঁড়িয়েছিলো তখনও।

নীলা বললো—বসো।

বনহুর নীলার কাছ থেকে একটু দূরে বসে পড়লো। তার হাতের মুঠোয় গাড়ির চাবিটা ছিলো। বনহুর গাড়ির চাবিটা নাড়া চাড়া করছিলো।

নীলা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ তাকিয়ে দেখলো, ছেলেগুলো তখনও নৌকা চালাচ্ছে। এক সময় বললো—মনির তুমি নৌকা চালাতে পারোনা?

একটু একটু পারি।

চলো না একটা নৌকা নিয়ে লেকের মধ্যে ঘুরে বেড়াই?

বনহুর ওর ইচ্ছায় বাধা দিলোনা, বললো—চলুন।

নীলা বললো—ওদিকে চলো।

কারণ ওদিকে তেমন কোন ছেলে মেয়ে বা লোকজন ছিলোনা? একটা সুন্দর নৌকা ওদিকে তীরে আটকানো ছিলো?

নীলা আগে আগে এগিয়ে চললো।

বনহুর ওর পিছনে।

নৌকায় চেপে বসে ডাকলো নীলা—এসো।

বনহুরও নৌকায় উঠে বসলো, বৈঠা তুলে নিলো সে হাতে। ঝুপ ঝাপ শব্দ তুলে বৈঠা চালাতে শুরু করছে বনহুর।

নীলা ডান হাত দিয়ে পানি নাড়তে লাগলো।

লেকের মাঝ-মাঝি এগিয়ে চলেছে নৌকা খানা।

নীলা বলে—মনির তুমি ভারী সুন্দর নৌকা বাইতে পারো।

ছোট বেলায় খুব নৌকা বাইতাম কিনা।

সত্যি তুমি অপূর্ব.....

আপামনি আমি একজন গরিব মুর্খ সাধারণ মানুষ। আপনি কত বড় মহান মহৎ সুশিক্ষিতা...

মনির তুমি নিজকে এতো ছোট ভাবো কেনো বলো তো? তোমার মধ্যে আমি যে অভূতপূর্ব প্রতিভা দেখতে পেয়েছি তা কারো সাধ্য নেই। মনির তুমি এমনি করে চিরদিন আমার পাশে থাকবে কথা দাও?

আপামনি আপনার জন্য কত উচ্চ শিক্ষিত কত ধনবান যুবক প্রতিক্ষা করছে আর আপনি এ সব কি বলছেন?

মনির আমি কিছু চাইনা। শুধু চাই তোমাকে.....

স্তব্ধ হয়ে যায় বনহুর। সে জানতো এমনি একটা অবস্থা আসবে তার জন্য প্রস্তুত ছিলো বনহুর তবু কোন জবাব দিতে পারে না সে ঐ মুহূর্তে।

নীলা বনহুরের বুকে মাথা রাখে।

বনহুর তেমনি ভাবে বৈঠা চালিয়ে যায়।

নীলা বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে—কোন কথা বলছো না কোনো মনির?

আপামনি।

না না তুমি আমায় নীলা বলে ডাকবে। বলো নীলা বলে। বলো মনির?

বড় সঙ্কোচ লাগছে আমার আপামনি কি করে আমি আপনার নাম ধরে ডাকবো?

আমি তোমাকে বলছি।

বেশ তাই ডাকবো কিন্তু সবার সামনে আপামনিই বলবো।

তাই ডেকো। মনির আকাশটা বড় সুন্দর লাগছে না?

হাঁ বড় সুন্দর। আপনার নীল দুটি চোখের মত.....

মনির তুমি এতো সুন্দর কথা বলতে পারো? তোমার কণ্ঠস্বর এতো সুন্দর.....

আপামনি আপনি আমাকে ভালবাসেন তাই আপনার কাছে আমার সব ভাল লাগে।

মনির!

বলুন?

তুমি গান শুনতে ভালবাসো?
বাসি কিন্তু কে আমাকে গান শোনাবে আপামনি?
আবার আপামনি। বলো নীলা?
আচ্ছা বলবো।
গান শুনবে?
শুনবো।
নীলা গান গায়। এতো সুন্দর গলা বনহুর শোনেনি কোনদিন।
অভূতপূর্ব অনুভূতি নিয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুর নীলার মুখের দিকে। বনহুর অভিভূত হয়ে যায়।
গান শেষ হয় নীলার।
বনহুর ওর চিবুকটা তুলে ধরে—সত্যি অপূর্ব নীলা তুমি।
মনির! নীলা বনহুরের বুকে মুখ লুকায়।
বনহুর বলে—চলুন এবার আমরা ফিরে যাই?
চলো।
তীরে ফিরে আসে ওরা।
নৌকা তীরে লাগিয়ে বনহুর নেমে দাঁড়ায়।
নীলা নামতে গিয়ে হাত বাড়ায় বনহুরের দিকে।
বনহুর হাত বাড়িয়ে নীলার হাত ধরে ওকে নামিয়ে নেয়। হাসে নীলা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।
বনহুরও হাসে।
যেমন বনহুর ফিরে দাঁড়িয়েছে অমনি হতভম্ব হয়ে গেলো সে, অদূরে মনির দাঁড়িয়ে আছে তার দু'চোখে বিস্ময় রাগ অভিমান ফুটে উঠেছে।
বনহুর যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।
নীলা কিছু বুঝতে না পেরে ডাকে—মনির এসো।
বনহুরের পা দু'খানা যেন মাটির মধ্যে বসে গেছে হাটু অবধি।
মনিরা ততক্ষণে ক্রুদ্ধভাবে অপর দিকে ফিরে চলেছে।
নীলা আবার ডাকে—মনির এসো যাই।
হাঁ চলুন আপামনি। বনহুরের কণ্ঠ যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হঠাৎ এমন জায়গায় এমন অবস্থায় মনিরাকে দেখবে সে ভাবতে পারিনি।
নীলা বলে—মনির ওকে তুমি চেনো?
হাঁ।
কে সে?
আর একদিন বলবো আজ চলুন আপামনি।
নীলা আর বনহুর গাড়িতে চেপে বসে।

বনহুরই এখন ড্রাইভ আসনে বসে গাড়ি চালাতে শুরু করছে।

নীলা বলে—কথা বলছো না কেনো? হঠাৎ তোমার কি হলো বলো তো?

কিছু না।

নীলা ওর সংক্ষিপ্ত জবাবে খুশি হতে পারে না। সেই মেয়েটিকে দেখার পর হঠাৎ রংলাল যেন সম্পূর্ণভাবে পালটে গেছে। নীলার ভাল লাগেনা যেন।

বাসায় ফিরে বনহুর চলে যায় নিজের কামরার দিকে।

নীলা কোন কথা বলেনা, সে দূর থেকে লক্ষ্য করলো ওকে। সেও চলে গেলো নিজের ঘরে।

❑

মনিরা নূরকে নিয়ে আজ গিয়েছিলো লেকের ধারে। অবশ্য নূরের জেদেই সে গিয়েছিলো, ড্রাইভারকে সঙ্গে করে। নূর যখন তার সঙ্গীদের নিয়ে লেকের মধ্যে নৌকা নিয়ে খেলা করছিলো তখন মনিরা লেকের ধার ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো দক্ষিণ দিকে।

খানিকটা এগুতেই হঠাৎ চমকে উঠে মনিরা, অদূরে নৌকা থেকে নেমে দাঁড়ালো যেন তারই প্রিয়তম মনির! একটা তরুণী তার দিকে হাত বড়িয়ে দিয়েছে। মনিরা ভাবলো হয়তো তার চোখের ভুল, অন্য কেউ হবে। কিন্তু এগুতেই স্তম্ভিত হলো সে, এ যে তারই স্বামী।

ঠিক ঐ মুহূর্তেই ফিরে দাঁড়িয়েছিলো বনহুর সঙ্গে সঙ্গে মনিরার সাথে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিলো তার। এমন একটা অবস্থা ঘটে যাবে ভাবতে পারেননি বনহুর। সে নির্বাক হয়ে পড়েছিলো সেই দন্ডে।

মনিরার সমস্ত শরীরে কে যেন আগুন জ্বেলে দিলো। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো। কোনো রকমে সে ছুটে গিয়ে গাড়িতে চেপে বসলো।

ড্রাইভার দূরে দাঁড়িয়েছিলো সে মনিরাকে গাড়িতে এসে বসতে দেখে দ্রুত এগিয়ে এলো—বেগম সাহেবা আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

মনিরা দু'হাতের মধ্যে মাথা গুজে চুপ করে বসে থাকে কোন কথা বলে না।

ড্রাইভার ব্যস্ত হয়ে পড়ে দ্রুত চলে যায় সে লেকের ধারে যেখানে লেকের মধ্যে নৌকা নিয়ে খেলা করছিলো নূর। ব্যস্ত কণ্ঠে ডাকলো—নূর নূর এসো বেগম সাহেবা বাসায় ফিরে যাবেন।

নূর আর বিলম্ব না করে সাথীদের সঙ্গে করে ফিরে এলো নৌকা নিয়ে তীরে।

নৌকা থেকে লাফিয়ে নেমে এলো নূর—কি হয়েছে ড্রাইভার?

বেগম সাহেবা অসুস্থ বোধ করছেন। চলো নূর।

নূর মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে ছুটে এলো গাড়ির পাশে। মাকে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে থাকতে দেখে সে চিন্তিত হয়। ব্যস্ত কণ্ঠে বলে—আম্মি তোমার কি হলো? ও আম্মি কি হলো বলোনা? আম্মি.....

মা'র কেমন করছে। ড্রাইভার শীগ্‌গীর বাড়ি চলো। বললো মনিরা।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লো।

নূর মাকে চেপে ধরে বসে আছে, তার চোখে মুখে একটা ভয়ঙ্কর দুঃচিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। সে ভেবে পাচ্ছে না হঠাৎ তার মায়ের কি হলো।

গাড়ি দরজায় পৌছতেই মনিরা গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গেলো নিজের ঘরে নূর এসে মরিয়ম বেগমকে বললো—দাদী আম্মা দেখোগে আম্মির হঠাৎ কি যেন হয়েছে।

নূরের কথায় মরিয়ম বেগমের মনটা আচমকা চমকে উঠলো বললো তিনি—কোথায় তোর আম্মি?

ঘরে! গম্ভীর গলায় বললো নূর।

মরিয়ম বেগম ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেলেন মনিরার ঘরের দিকে।

মনির তখন বিছানায় পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মরিয়ম বেগম কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে বিস্মিত হলেন কারণ অসুখ হলে সে অমন করে কাঁদবে কেনো। তিনি এসে বললেন মনিরার শিয়রে, পিঠে হাত রেখে ডাকলেন—মনিরা কি হয়েছে মা? মনিরা .....মনিরা.....

মনিরার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেলো।

মরিয়ম বেগম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি মনিরার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে স্বস্নেহে বললেন—কি হয়েছে মা বলো?

মনির আঁচলে চোখ মুছে সোজা হয়ে বসলো—তার সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

নূর স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিলো মায়ের দিকে, হঠাৎ তার আম্মি এমন হলো কেনো। কি হয়েছে তার ভেবে পাচ্ছে না সে যেন।

মরিয়ম বেগম পুনরায় বলেন—বলো মা? বলো কি হয়েছে তোমার?

নূরকে লক্ষ্য করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে মনিরা—নূর তুমি বাইরে যাও।

নূর কিছু বুঝতে না পেরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

মনিরা অশ্রুসিক্ত নয়নে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে—মামীমা আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। আমি সব হারিয়ে ফেলেছি.....

কি বলছো আমি কিছু বুঝতে পারছিনা মা?

তুমি বুঝবেনা মামীমা, তুমি বুঝবেনা। জানো তোমার ছেলে আর আসে না কেনো? সে নতুন এক সঙ্গিনী খুজে নিয়েছে.....কণ্ঠ চাপা কান্নায় ভরে উঠে।

মরিয়ম বেগমের চোখ দুটো ব্যাকুলভাবে মনিরার মুখে ঘুরে বেড়ায় বলেন তিনি কি বলছিস্ মনিরা?

হাঁ মামীমা সব সত্য বলছি। তোমার ছেলে হারিয়ে গেছে আর তাকে খুঁজে পাবো না। আমি কি নিয়ে বাঁচবো বলো বলো মামীমা? মনিরা দু'হাতে মরিয়ম বেগমের গলা জড়িয়ে ধরে।

মরিয়ম বেগম যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। তিনি মনিরাকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মনিরা বেশি কিছু বললো না শুধু যে কেঁদে কেটে অস্থির হলো। খেলোনা সে কিছু, কারও সঙ্গে কথাও বললো না। নূর তো ভেবেই পেলো না হঠাৎ তার আম্মির কি ঘটলো। সমস্ত বাড়িতে একটা নিরানন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

মনিরা নির্জন ঘরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সমস্ত বালিশ তার অশ্রু জলে ভিজে উঠেছে। তার জীবনের সব সপ্ন যেন ভেংগে চুরমার হয়ে গেছে। কোন দিন আর সে তাকে ফিরে পাবে না।

❑

অনেক রাত।

সমস্ত শহর নিদ্রায় অচেতন।

হঠাৎ পিছন জানালার শার্শী খুলে যায়।

মনিরার ভিতরটা কঠিন হয়ে উঠে; বুঝতে পারে সে এসেছে। তাড়াতাড়ি বালিশে মুখ গুজে চুপ করে থাকে মনিরা। ভারী বুটের শব্দ ভেসে আসে তার কানে! তার বিছানার পাশে এসে থামলো সে।

মনিরা আরষ্ট হয়ে পড়ে আছে, রাগ অভিমান তাকে শক্ত করে তুলেছে। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

পাশে বসলো সে।

মনিরার বুকটা কেমন যেন টিপ্ টিপ্ করছে। দাঁত দিয়ে অধর চেপে ধরছে সে কঠিন ভাবে।

পিঠে হাত রাখলো বনহুর—মনিরা।

কোন জবাব দিলো না মনিরা, যেমন শুয়েছিলো তেমনি পাথরের মত কঠিন হয়ে পড়ে রইলো।

আবার ডাকলো বনহুর—মনিরা। মনিরা.....লক্ষীটি শোন।

এবার মনিরার নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শোনা গেল। কিন্তু কোন জবাব দিলো না।

বনহুর বললো—মনিরা শোন, তুমি ভুল বুঝনা আমাকে। মনিরা.....

এবার মনিরা ঝড়ের বেগে বিছানায় উঠে বসলো—কে তুমি কি চাও এখানে? তোমাকে আমি চিনি না। বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও.....

মনিরা স্থির হয়ে শোন। তুমি যা দেখেছো তা ভুল। তুমি যা ভাবছো সত্যি নয়—

না না তুমি যাও! না হলে এখনি নূরকে ডাকবো, তোমার আসল পরিচয় জানিয়ে দিবো তার কাছে। তুমি চলে যাও তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আছে একথা আমি.....

মনিরা আমার একটি কথাও তুমি শুনবে না।

না না চলে যাও বলছি।

বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় নিবিড় করে কিন্তু মনিরা কিছুতেই বনহুরের বাহু বন্ধনে নিজকে ছেড়ে দেয় না। সে কঠিনভাবে নিজকে মুক্ত করে নেয়।

বনহুর বলে, বেশ আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু আমার দুটি কথা তুমি শোন। তুমি যে মেয়েটিকে আমার সঙ্গে দেখেছ, তার সঙ্গে আমার কোন কুৎসিত সম্বন্ধ নেই। আর আমি যতটুকু করছি বা ওর সঙ্গে মিশছি তা আমার স্বার্থ নিয়ে, কারণ তুমি শুনে রাখো মনিরা ঐ মেয়েটির বাবা কান্দাই হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে। আমি সেই হত্যা রহস্যের মূল শিকড় উপড়ে ফেলতে চাই। আজ আমি যাচ্ছি, যেদিন তোমার মন থেকে সন্দেহের ছায়া মুছে যাবে সে দিন আমি আসবো। বনহুর কথা গুলো বলে উঠে দাঁড়ালো, পা বাড়ালো সে, যে পথে এসেছিলে সেই পথে বেরিয়ে যাবার জন্য।

মনিরার সব অভিমান মুছে গেলে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো —দাঁড়াও।

বনহুর দাঁড়িয়ে পড়লো।

মনিরা বললো—শোন।

বনহুর এগিয়ে এলো মনিরার পাশে।

মনিরা এবার বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বললো—তুমি যেতে পারবে না।

সে কি তুমি তো আমাকে চলে যেতে বললে।

না আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

মনিরা!

হাঁ!

এবার বনহুর বসে পড়লো খাটের পাশে।

মনিরা ওর জামার আস্তিন চেপে ধরে বললো—ও তোমার নাম ধরে ডাকলে, আমি নিজের কানে শুনেছি। বলো ও তোমার নাম জানলো কি করে।

বনহুর হাসলো—সে এক অদ্ভুত কাহিনী, বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। ঐ মেয়েটির নাম নীলা। ওদের বাগানে আমি মালির কাজ করতাম রংলাল ছিলো আমার নাম উদ্দেশ্য তোমাকে আগেই বলেছি। থামলো বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো।

মনিরার মুখমণ্ডল তখনও প্রসন্ন হয়নি সে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে স্বামীর মুখে।

ডিম লাইটের স্বল্প আলোতে বনহুরকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো মনিরা মুখে ক্রুদ্ধভাব টেনে রাখলেও মনে মনে সে স্বামীকে নিবিড় করে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠছিলো।

বনহুর কয়েক মুখ ধোয়া ছেড়ে বলে—নীলাই আমার রংলাল নাম পাল্টে ঐ নাম দিয়েছে। আমি অবশ্য আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম নীলার দেওয়া নতুন নামটা শুনে।

তা বুঝলাম কিন্তু ওর সঙ্গে তোমার এতো গভীরতা হলো কি করে।

আমার নয় নীলাই আমাকে.....

বুঝেছি কিন্তু কতদিন চলবে তোমার এই অভিনয়।

হেসে বললো বনহুর—যতদিন কার্যোদ্ধার না হবে। মনিরা তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

করি!

কিন্তু মাঝে মাঝে বিশ্বাস হারিয়ে ফেল এইতো? লক্ষীটি তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো না। নিজকে সংযত রাখার মত সমর্থ তোমার স্বামীর আছে। বনহুর মনিরাকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে।

এবার মনিরা স্বামীর বাহু বন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নেয় না।

সমস্ত রাত ওরা নানা গল্পে কাটিয়ে দেয়। একটু ঘামায় না ওরা দু'জন।

ভোর হবার কিছু পূর্বে বনহুর মনিরার কাছে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

নীলাও সমস্ত রাত ঘুমাতে পারেনি তার মনেও আজ অভূতপূর্ব আনন্দ। রংলাল সুন্দর গাড়ি চালানো শিখেছে। সুন্দরভাবে কথা বলতে শিখেছে। ওর কণ্ঠস্বর তার মনকে অভিভূত করে ফেলেছে।

ভোর হতে না হতেই নীলা তার সালটা গায়ে জড়িয়ে রংলালের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। রোজ খুব ভোরে ঘুম ভাংগে ওর, আজ এতো বেলা ঘুমাচ্ছে। নীলা আলগোছে প্রবেশ করে।

রংলাল তার বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

নীলা এসে দাঁড়ালো ওর বিছানার পাশে। ডাকলো সে—মনির মনির.....

বনহুর ভোর রাতে শুয়েছে তাই আজ ওর ঘুমটা বেশি জমে উঠেছে। নীলার ডাক ওর কানে পৌঁছায় না।

নীলা ওর গায়ে হাত রেখে ডাকে—মনির.....মনির রংলাল.....

ও বিরক্ত করো না মনিরা একটু ঘুমাতে দাও।

মনিরা! কে মনির? হাসে নীলা তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়ে বাগান থেকে একটা সুন্দর গোলাপ তুলে ফিরে আসে রংলালের ঘরে।

ফুলটা ওর বালিশের পাশে রেখে বেরিয়ে যায় নীলা।

অনেক বেলায় আজ ঘুম ভাংগে বনহুরের। বিছানায় উঠে বসতেই নজরে পড়ে নীলার রেখে যাওয়া ফুলটা। ফুলটা হাতে তুলে নিয়ে মুদু হাসে বনহুর। বুঝতে পারে নীলা এসেছিলো তার ঘরে।

❑

আব্বু ক'দিন হলো লক্ষ্য করছি তুমি সব সময় কি যেন ভাব। কেমন যেন শুকনো মনে হচ্ছে তোমাকে। বলোতো কি হয়েছে তোমার? চায়ের টেবিলে বসে প্রশ্ন করলো নীলা—খান বাহাদুর আমির আলীকে।

রংলাল পরিবেশন করছিলো।

নীলার কথাগুলো শুনে তাকালো সে আমির আলীর মুখে।

আমির আলী কন্যার প্রশ্নে প্রথম একটু হক চকিয়ে গেলেন তারপর নিজকে সংযত করে নিয়ে বলেলেন ক'দিন থেকে শরীরটা বড় ভাল যাচ্ছে না মা।

ডাক্তার দেখাও না কেনো আব্বু?

শুধু শরীর খারাপ নয় এর সঙ্গে কাজের চাপও বেড়ে গেছে তাই.....

আব্বু তোমাকে বলেছিলাম রংলালকে তুমি তোমার গবেষণাগারে নিতে পারো। ও তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

আমির আলী সাহেব বললেন—আমিও তাই ভাবছি। রংলাল বেশ কজের ছেলে ওকে আমি আমার গবেষণাগারেই নেবো। তবে একটু লেখাপড়া জানা দরকার এই যা অসুবিধা।

আব্বু তোমার কোনকিছু ভাবতে হবে না। ওকে আমি লেখাপড়া অনেকটা শিখিয়ে নিয়েছি। আর একটা কথা তুমি শুনলে খুশি হবে।

বলো মা?

রংলাল সুন্দর গাড়ি চালাতে শিখেছে।

তাই নাকি? কবে ওকে গাড়ি চালানো শেখালি নীলা?

রোজ বিকেলে ।

বাঃ বাঃ ভালই হয়েছে।

আব্বু তুমি ওকে তোমার গবেষণাগারে কাজ দিও।

আচ্ছা মা তাই দেবো।

আব্বু এ মাসে রংলালের মাইনেটা কিছু বাড়িয়ে দিও কিন্তু। বাড়িতে বুড়ো মা আছে তার জন্য কিছু টাকা আর জিনিসপত্র পাঠাবে।

আমীর আলী সাহেব বললেন—আচ্ছা দেবো। হ্যাঁ মা একটা কথা আগামী অমাবস্যায় আমাকে আবার ফিরু ডাকবাংলায় যেতে হচ্ছে।

তোমার কাজ বুঝি শেষ হয়নি আব্বু?

না মা হয়নি।

আব্বু রংলাল আমদের সঙ্গে যাবে না?

যেতে চায় যাবে। কি রংলাল তুমি যাবে নাকি তোমার চাচা চাচীকে দেখতে?

হাঁ মালিক আমি যাবো। তাছাড়া মা আছে তাকেও দেখে আসবো। কথাগুলো বললো রংলাল।

নীলার দু'চোখে আনন্দ ঝরে পড়ে।

আবার ফিরু গাঁও-এ যাবে নীলা এবার তাদের সঙ্গে থাকবে রংলাল। সেবার নীলা কোথাও বেড়াতে বের হয়নি। এবার সে বেড়াবে। রংলাল গাড়ি চালানো শিখেছে কাজেই কোন অসুবিধা হবেনা। ওকে সঙ্গে করে যেখানে মন চাইবে সেখানেই যাবে সে।

বৈকালে নীলা আলগোছে এসে দাঁড়ালো রংলাল এর কক্ষে কিন্তু রংলাল কোথায়। হঠাৎ তার নজর পড়লো বাগানের মধ্যে ফোয়ারার ধারে চুপচাপ বসে আছে রংলাল।

নীলা পিছন থেকে ওর কোলে একটা ফুল ছুড়ে দেয়।

চমকে ফিরে তাকায় বনহুর।

নীলাকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আপামনি!

না আপামনি নয়—বলো নীলা।

হু হু আপনার নাম আমি ধরতে পারবো না।

সত্যি বলছো?

আপনি যে মালিকের মেয়ে।

তাতে কি। আচ্ছা রংলাল?

বলুন?
আগামী অমাবস্যায় আমরা ফিরু গাঁও যাবো।
হাঁ। হঠাৎ বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়লো।
নীলা ওর মুখভাব লক্ষ্য করে বললো—কি হলো তোমার মনির?
কিছু না।
নিশ্চয়ই তোমার কিছু হয়েছে।
প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বললো বনহুর—চলুন আপামনি বাইরে যাই।
চলো মনির। জানো আজ কোথায় যাবো আমরা?
আমি জানবো কেমন করে?
আজ যাবো অনেক দূর যেখানে কেউ থাকবে না। শুধু তুমি আর আমি...
আপামনি সন্ধ্যা হতে বেশি দেরী নাই তাই বলছিলাম...
কোন কথা শুনতে চাইনা মনির—চলো গাড়ির পাশ চলো।
বনহুর নীলার পিছনে পিছনে অনুসরণ করে।
আজ নীলা গাড়ির ড্রাইভিং আসনে বসে বলে—এসো।
বনহুর সুবোধ বালকের মত তার আদেশ পালন করলো।
শহর ছেড়ে অনেক দূর এলো নীলা।
সুন্দর একটি বনভূমি।
গাড়ি রেখে নেমে পড়লো নীলা। আজ নীলা ওর হাত ধরে নিয়ে চললো, বললো যে মনির এমন নির্জন জায়গা বেছে নিয়েছি, এখানে শুধু আমরা দু'জনা কেউ আজ আমদের মিলনে বাধা দিতে পারবে না।
বনহুর বললো—আপামনি...
না আপামনি নয় বলো নীলা।
বেশ তাই হলো—নীলা আজ আমি একট স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে বলবো বলবো করে বলা হয়নি।
স্বপ্ন!
হাঁ।
চলো ওখানে বসি গিয়ে।
একটা উঁচু জায়গায় পাশাপাশি বসে নীলা আর বনহুর।
বলে নীলা—এবার তোমার স্বপ্ন কাহিনী বলো শুনি?
বনহুর মুখোভাব গম্ভীর করে বললো—স্বপ্ন দেখলাম তুমি আর আমি একটা সুন্দর বাগানে বসে আছি। ফুল দিয়ে আমাদের দু'জনার সমস্ত শরীর সুসজ্জিত। ফুলে ফুলে তুমি ফুলরাণী সেজেছো আর আমি আমার শরীরেও ফুলের পোশাক।
তারপর?

তুমি গান গাইছো আমি তোমার মুখে তাকিয়ে আছি। তুমি হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরতে যাচ্ছো...ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি জমকালো পোশাক পরা লোক...

বলো বলো থামলে কেনো? তারপর.....

জমকালো পোশাক পরা লোকটা তার পোশাকের মধ্যে থেকে একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বের করে বসিয়ে দিলো আমার বুকে.....

চুপ করো! চুপ করো মনির আমি আর শুনতে চাইনা। কি জানি আমার ভয় হচ্ছে। জানো সেই জমকালো পোশাক পরা লোকটা কে? সেই তো দস্যু বনহুর। যে আমার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিতে চায়। না না আর এখানে বিলম্ব করবোনা মনির। চালো ফিরে যাই।

আমার স্বপ্নের শেষটুকু শুনবেনা—নীলা?

না আমি আর শুনতে চাইনা। চলো মনির ফিরে চলো।

বনহুর বললো—সন্ধ্যার একটু বাকি আছে। আর বসবেনা?

না চলো। নীলা উঠে পড়ে।

বনহুর হাসলো, সে এ জন্যই স্বপ্ন কাহিনী বলেছিলো। নীলার সরল মন ভয়ে দুঃখ ভাবনায় মুষড়ে পড়ে। চারিদিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় নীলা।

ফিরে আসে ওরা গাড়ির পাশে।

নীলাকে লক্ষ্য করে বলে বনহুর—নীলা তুমি বসো আমি ড্রাইভ করছি।

তাই চলো মনির। বড্ড ভয় করছে যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়। যদি সে এসে পড়ে।

মরতে ভয় তোমাকে নিয়ে।

মনির!

হাঁ কারণ দস্যু বনহুর আমাকে হত্যা করে তোমাকে নিজের করে নিতে চায়।

কোনদিন তা হবেনা। আমি শুধু তোমাকে চাই।

নীলা দস্যু বনহুর যা বলে তা সে করে। তুমি তো বলেছো দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নাই।

না না ও সব কোন কথা আজ এ মুহূর্তে আমি শুনতে চাইনা। তুমি গাড়ি ছাড়ো.....

বনহুর এবার গাড়ি ছাড়লো।

গাড়িখানা নির্জন পথ ছেড়ে শহরের পথে এসে পড়লো জনমুখর রাজ পথ।

নীলা আশ্চর্য হয়ে দেখছে রংলাল সুন্দরভাবে গাড়ি চালিয়ে চলেছে। এতো জনতার ভিড়েও সে দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালাচ্ছে।

নীলা অভিভূত বিস্মিত হতবাক হয়ে গেছে যেন।

একদিন হঠাৎ নীলা রংলালের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পায় সে মনোযোগ সহকারে কি যেন লিখছে।

নীলা পা টিপে টিপে রংলালের পিছনে এসে দাঁড়ালো, উঁকি দিলো তার কাঁধের উপর দিয়ে সম্মুখে। নীলা হাতের নিচে কাগজ খানায় লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেলো। রংলাল ইংরেজিতে চিঠি লিখছে।

নীলা যেন পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে যায়। তার গলা দিয়ে কোন কথা বের হয়না। সে যেমন অতি সন্তর্পণে এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

বনহুর নীলার উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিলো। সে চিঠিখানা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে ডাকলো—নীলা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েলো নীলা, বিস্ময় নিয়ে অবাক চোখে তাকালো সে রংলালের মুখের দিকে। আজ নীলা ঐ দুটি চোখ অদ্ভুত এক দৃষ্টি দেখতে পায়! সে চাহনি যেন রংলালের নয়।

নীলা সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না।

বনহুর তার শয্যায় বসে বসে চিঠিখানা লিখছিলো, এবার সে উঠে এল নীলার পাশে।

নীলা তখনও স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওর চোখ দুটির দিকে।

বনহুর ঠিক নীলার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। হেসে বললো—খুব আশ্চর্য হয়ে গেছো নীলা! অসময়ে তুমি আসবে জানলে সাবধান হতাম।

ধীরে ধীরে নীলার মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো, এবার কঠিন কণ্ঠে বললো—বলুন আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? নিশ্চয়ই আপনি সাধারণ রংলাল নন।

হঠাৎ বনহুর হেসে উঠলো।

নীলা আরও অবাক হয়ে গেছে ওকে যত দেখছে ততই যে হতবাক বিস্মিত হচ্ছে। এমন করে সে তো কাউকে হাসতে দেখেনি অদ্ভুত এ হাসি।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—মিস নীলা আজ আপনাকে কয়েকটি কথা বলবো।

না আমি আপনার কোন কথা শুনতে চাইনা। বলুন আপনি কে?

আমার পরিচয় জানাতে কোন আপত্তি নেই তবে এখনও সম্পূর্ণ সময় আসেনি। হাঁ প্রথমে একটি কথা আপনাকে বলে রাখি কারণ আমি যেই হইনা কেনো আপনার অমঙ্গল আমার চিন্তা নয় মনে রাখবেন।

আমার মঙ্গল চান কি অমঙ্গল চান আমি জানতে চাই না। জানতে চাই মিথ্যা রংলালের অভিনয় করে আমাকে আপনি.....

সেজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী মিস নীলা।

বলুন কে আপনি?

আমি আমার পরিচয় এখন দিতে পারছিনা তবে বিশ্বাস করুন আমি কে এ কথা আপনাকে জানাবো। শুধু আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত আমাকে আপনি কোন প্রশ্ন করবেন না। এই আমার অনুরোধ। বনহুর কথাগুলো বলে ফিরে এলো নিজের বিছানায়। বালিশের তলা হতে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে তাতে অগ্নি সংযোগ করে বলে—মিস নীলা জানি আপনি আমার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিন্তু আমি যা করেছি। সব আমার মনের এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

নীলার দৃষ্টি তখনও বনহুরের দিকে নিবদ্ধ ছিলো। এতোদিন সে রংলালকে অশিক্ষিত একটি সাধারণ লোক মনে করে তার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে, কি ভাবে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেছে, কত বকেছে, সব কথা তার মনে উদয় হতে লাগলো। গাড়ি চালানো ব্যাপার খানাও এখন তার কাছে খোলাসা হয়ে গেছে। সামান্য ক'দিনেই রংলাল এমন দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালানো শিখলো কি করে ভেবে বাক হয়েছিলো নীলা। এখন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। রংলাল শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত যুবক, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

বনহুর এগিয়ে এলো নীলার পাশে—আমাকে ক্ষমা করতে পারছেন না, তাইনা? সত্যি আমি অপরাধী মিস নীলা। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বনহুর। একটু থেমে বলে—বেশ তা হলে আমি চলে যাবো। আপনাকে আর বিরক্ত করবোনা। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি কর্তব্যের খাতিরে আপনাদের বিরক্ত করেছি....

বনহুর তার জামা কাপড়গুলো গোছাতে শুরু করে।

নীলা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসে—কোথায় যাবেন আপনি?

আমার কাজে।

কাজ। কিসের কাজ আপনার?

যে কাজের জন্য আপনাদের এখানে রংলালের বেশে ছিলাম।

কাজ কি আপনার শেষ হয়েছে?

না।

তবে কেনো যাবেন আপনি?

আপনাদের কাছে আমি অপরাধী। মানে আপনার কাছে...

না আপনি অপরাধী নন। অপরাধী আমি! না জেনে অনেক সময় আপনাকে আমি অনেক কিছু বলেছি....সেজন্য আমি লজ্জিত, দুঃখিত।

মিস নীলা! আপনি কোন ভুল করেননি। দোষতো সব আমার। একটি কথা আপনাকে আজ জানিয়ে রাখি, খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব আপনার পিতা নন...

মিথ্যা কথা। কঠিন কণ্ঠে বললো নীলা।

না মিস নীলা মিথ্যা নয়। তবে তিনি আপনাকে নিজ কন্যার মতই ভালবাসেন, স্নেহ করেন একথাও মিথ্যা নয়।

দু'চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে নীলা বনহুরের দিকে। আজ কি সে সব কিছু দুঃস্বপ্ন দেখছে। রংলাল আজ তার কাছে পর হয়ে গেলো। তার বাবা তার আপনজন নন, এ সব কি শুনছে সে।

নীলা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে চিৎকার করে উঠে—না না, আমি একথা বিশ্বাস করিনা।

বনহুর তার বলিষ্ঠ হাতে নীলার মুখ চেপে ধরে—চিৎকার করবেন না। সব কিছুর প্রমাণ আপনি পাবেন মিস নীলা। কিন্তু আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত আপনাকে অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হবে।

আজ যেন নতুন করেই বনহুরের ছোয়া নীলার শরীরে শিহরণ জাগায়। নতুন এক অনুভূতি নাড়া দেয় তার হৃদয়ে। নীলা ছুটে বেরিয়ে যায় সেই কক্ষ থেকে।

সমস্ত দিন নীলা আর বনহুরের সম্মুখে আসে না। একটা লজ্জাতুর ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। রংলালের সঙ্গে তার দিনগুলি স্মৃতি আজ সে মন্থন করে চলে। প্রথম দিনের কথা আজও ভোলেনি নীলা। একটি ফুলের আশায় সে বাগানে গিয়েছিলো, এই মালি ঐ ফুলটা দাও তো।

ফিরে তাকিয়েছিলো রংলাল।

নীলা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলো রংলালকে দেখে। পৌরুষ দীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারা? রক্তিম গণ্ড, প্রশস্ত ললাটে মুক্তা বিন্দুর মত ফোটা ফোটা ঘাম।

সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনি সে কিছুক্ষণ।

রংলাল নীলার এ দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলো। তাড়াতাড়ি সে একটি গোলাপ গাছ থেকে ছিড়ে নিয়ে বাড়িয়ে ধরেছিলো—নিন।

নীলা তারপর অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো। রংলালকে সে যেমন করে হোক সভ্য সমাজে তুলে ধরবে। তাকে যে মনের মত করে গড়ে নেবে। নীলার মনে সব কথা ভেসে উঠে একটির পর একটি করে।

নীলা রংলালকে অনেকদিন নিবিড় করে পেয়েছে। ওর বুকে মাথা রেখেছে কিন্তু আশ্চর্য, রংলাল তো কোন সময় ওকে নিবিড় করে কাছে টেনে নেয়নি। তখন হয়তে নীলা ভেবেছে এটা রংলালের দুর্বলতা কারণ সে আরও

অনেক তফাৎ। সে মালিকের কন্যা আর রংলাল যত সুন্দর বলিষ্ঠ পুরুষই হোক, সে চাকর।

আজ রংলালকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে নীলা। প্রথমে সঙ্কোচ দ্বিধা জন্মালেও পরে সে অন্তরে অন্তরে আনন্দ বোধ করতে লাগলো। ওর আসল পরিচয় নিশ্চয়ই অনেক বড়। অনেক শিক্ষিত তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ওর লেখাগুলিই তার প্রমাণ।

কি লিখছিলো সে আর কার কাছেই বা লিখছিলো। কে এই রংলাল যার পরিচয় সে এখনও জানে না। নীলা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হয়েছে খান বাহাদুর আমির আলী তার পিতা নয় এ কথা সে বিশ্বাস করতে পারছেনা। ওর মনে হচ্ছে এক্ষুণি ছুটে গিয়ে তার আব্বুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করে...আব্বু! আমি তোমার মেয়ে নই...কিন্তু সে তাকে বার বার নিষেধ করেছে, মিস নীলা। আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত আপনকে ধৈর্য ধরতে হবে। তবে কি কোন গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে তার জীবন কহিনীর সঙ্গে। কে তার সত্যিকারের পিতা আর আমির আলীই বা কে। কি করে সে এলো তার কাছে।

নীলা ছটফট করে। একবার মনে করে সব কথা যে খান বাহাদুর সাহেবকে বলে দেবে, কিন্তু ওর কথা মনে হয়। দীপ্ত বলিষ্ঠ সেই কণ্ঠ —অসীম ধৈর্য ধরুন মিস নীলা....

হাঁ সে ধৈর্যই ধরবে। আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত সে প্রতিক্ষা করবে কোন এক রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য। আরও একটা কথা নীলার আজ বেশি করে মনে হচ্ছে। আজ ক'দিন থেকে খাঁ বাহাদুর আমির আলীকে সে অত্যন্ত ভিষণ মলিন দেখছে। সব সময় তিনি তার গবেষণাগারে কি যেন করেন তিনিই জানেন।

নীলার চারিদিকে যেন একটা রহস্য জাল ছড়িয়ে পড়ে সে যেন ক্রমেই সেই রহস্য জালে জড়িয়ে পড়ছে।

পদশব্দে চমকে উঠে নীলা। চোখ তুলতেই অবাক হয় সে। রংলাল চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে—আপামনি আপনার চা।

নীলার চোখে মুখে বিস্ময় ঝরে পড়েছে।

ওকে স্বাভাবিক করবার জন্যই বনহুর এসেছে এ মুহূর্তে চায়ের কাপ নিয়ে। পূর্বের মতই হেসে বলে—আজ বেড়াতে যাবেন না আপামনি?

নীলা ওর হাত থেকে চায়ের কাপ তুলে নেয়। তারপর বলে—যাবো।

খুশি হয়ে বেরিয়ে যায় বনহুর।

গাড়ি পরিষ্কার করছিলো বনহুর, নীলা এসে দাঁড়ায় তার পাশে —কই হলো?

বনহুর ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—হাঁ হয়েছে! নীলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই অবাক হলো বড় ভার লাগছে আজ নীলাকে। সুন্দর করে সেজেছে নীলা আজ।

বনহুর হঠাৎ বলে উঠলো—অপূর্ব!

নীলা যেন লজ্জায় সঙ্কোচিত হয়ে উঠলো। রাঙা হয়ে উঠলে ওর গণ্ডদ্বয়।

বনহুর বললো—ড্রাইভ আসনে না পাশে।

নীলা কোন কথা না বলে ড্রাইভ আসনের পাশে উঠে বসলো।

বনহুর এবর ড্রাইভ্ আসনে বসলো।

গাড়িখানা বেরিয়ে এলো খান বাহাদুর আমির আলীর গাড়ি বারান্দা থেকে।

গাড়ি জনমুখর রাজ পথ বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

বললো বনহুর—আজ কোথায় আদেশ করুন?

নীলার মুখে দুষ্টোমির হাসি ফুটে উঠলো। বললো—যেখানে আপনার খুশি।

উহুঁ! আপনি নয় তুমি।

না।

কেনো?

এখন আপনাকে কি বলে ডাকবো বলুন।

কেনো আপনি যা বলে ডাকতেন।

মনির!

হাঁ, ঐ নামেই ডাকবেন!

না,. ডাকবেন নয়, ডেকো।

বেশ তাই হবে বনহুর খুশি হলো। সে চেয়েছিলো পরিবেশটা স্বাভাবিক করে আনতে। নীলার কাছে সহজ হওয়াটাই তার দরকার। কারণ এখনও বেশ কয়েকটা দিন তাকে এখানে কাটাতে হবে।

কিছুক্ষণ তাদের নীরবে কাটে।

নীলা বলে উঠে—ভারি সুন্দর গাড়ি চালাতে পারো। শুধু আমাকে হয়রানি করেছো।

হাসে বনহুর।

নীলা এবার মুখোভাব গম্ভীর করে বলে—আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না তাই আমার কাছেও তোমার পরিচয় গোপন রেখেছে? বলো বন্ধু, বলো, কে তুমি?

আজ নয় নীলা।

উহুঁ তোমাকে বলতে হবে।

যদি বিদায় দাও তাহলে আমার পরিচয় তোমাকে জানাতে রাজি আছি।

বিদায়! চলে যাবে তুমি?

যদি না ছাড়ো, যদি আমার পরিচয় তোমাকে জানাতে হয় তা হলে বিদায় নিতে হবে বৈকী। চলো নীলা আজ নতুন এক জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাবো।

নতুন জায়গা?

হাঁ।

কোথায়?

মজুরদের বস্তিতে।

মজুরদের বস্তি নতুন জায়গা?

আমার কাছে নয় তোমার কাছে নীলা! কারণ তুমি কোনদিন এদের মধ্যে আসোনি কিনা।

বেশ চলো।

গাড়ি আরও কিছুক্ষণ চলার পর একটা নোংরা বস্তির পাশে এসে থামলো।

গাড়ির দরজা খুলে ধরলো বনহুর—নেমে এসো।

নীলা নেমে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে দূর থেকে বস্তির লোকজন বনহুরকে দেখে ফেলেছিলো তারা উঠি পড়ে করে ছুটে আসে। বনহুরকে তো তারাও জানে না, জানে এই লোকটা তাদের মুখে খাবার তুলে দেয়। পরনে বস্ত্র এনে দেয়। অসুখে ঔষধ যোগায়।

ছুটে এলো উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ জীর্ণ কঙ্কাল সার লোকগুলো। ঘিরে দাঁড়ালো বনহুরকে সবাই। ছালাম জানাতে লাগলো শ্রদ্ধাভরে।

বনহুর পকেট থেকে এক গাদা টাকা বের করে সবাইকে দিতে শুরু করলো।

নীলার দু'চোখে বিস্ময়। যাকে তার আব্বু মাসে দু'শো টাকা মাইনে দেয় আর সেই কিনা হাজার হাজার টাকা বিলিয়ে দিচ্ছে অকাতরে দীন হীন বস্তির অসহায় লোকগুলির মধ্যে।

অগণিত দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ওকে যেন দেব পুরুষ বলে মনে হচ্ছিলো।

একটা বৃদ্ধা এগিয়ে এলো।

বনহুর তাকে ডাকলো—মা এই নাও তোমার টাকা।

বৃদ্ধার মুখে হাসি ফুটলো। টাকা হাতে নিয়ে তার আনন্দ।

বনহুর নীলাকে লক্ষ্য করে বললো—নীলা তুমি আমার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে। এইতো এরাই আমার মা বাবা ভাইবোন।

নীলার দু'চোখে বিস্ময়। সে যেন স্তম্ভিত, হতবাক হয়ে গেছে।

একজন বৃদ্ধ এসে বললো—বাবা আমার ছেলেটার খুব অসুখ। সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। তুমি এসেছো শুনে কাঁদছে। তোমাকে এক নজর দেখতে চায়.....

বনহুর নীলাকে লক্ষ্য করে বলে—তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো আমি আসছি।

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

দুর্গন্ধময় অন্ধকার ঘরে ঢুকতে পারবে না নীলা।

তুমি যদি পারো, আমিও পারবো চলো।

বেশ চলো।

বনহুর আর নীলা পাশাপাশি এগিয়ে চলে।

সেই বৃদ্ধা এগোয় আগে আগে।

যখন বনহুর নীলা বস্তির মধ্য দিয়ে এগুচ্ছিলো তখন অগণিত ছেলে মেয়ে আর বস্তির মানুষ তাকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলো।

বনহুর আর নীলা সেই বৃদ্ধার কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করলো। আধো অন্ধকার দুর্গন্ধময় অপরিচ্ছন্ন জায়গা। একটা তেলচিটে বিছানায় শুয়ে আছে একটি বালক।

বনহুর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলো।

পিছনে নীলা।

বালকটি বনহুরকে দেখা মাত্র রোগ শয্যায় উঠে বসে আনন্দ উচ্ছল কণ্ঠে বললো—ভাইয়া আপনি এসেছেন। আমার বড্ড খুশি লাগছে। কতদিন আপনি আসেন নাই...

বনহুর এগিয়ে গিয়ে ওর বিছানায় বসে পড়লো, ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—ভাই এই তো এসেছি। তোমার অসুখ...

ভাইয়া! এবার আমার অসুখ সেরে যাবে।

আচ্ছা আবার এসে দেখে যাবো তোমাকে।

আসবেন ভাইয়া।

নিশ্চয় আসবো। বনহুর পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে অসুস্থ বালকের বৃদ্ধ মাতার হাতে দিয়ে বললো— ওর ভালভাবে চিকিৎসা করবে।

বনহুর আর নীলা ফিরে এলো গাড়ির পাশে। নীলাকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর— দেখলে নীলা, এরাও মানুষ। আর তোমরাও মানুষ কিন্তু.....

বলো, থামলে কেনো?

থাক এখন নয়, চলো গাড়িতে বসে বলবো।

বনহুর গাড়ির দরজা খুলে ধরে, উঠো।

নীলা চেপে বসে।

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসলো।

গাড়ির চার পাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য দুঃস্থ মানুষ। সবাই হাত নেড়ে বনহুরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

বনহুর হাত নাড়লো।

গাড়িখানা স্পীডে এগিয়ে চলেছে।

বনহুর গাড়ি ছাড়বার পূর্বে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিয়েছিলো। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো— কিন্তু তোমরা আর ওরা কত তফাৎ! নীলা!

বলো!

ঠিক একটা নতুন জায়গা দেখলে আজ তাই না?

নীলা নীরব। কারণ সে সত্যি কোনদিন এমন নিকৃষ্ট বস্তিতে আসেনি। আসার কোন প্রয়োজনও মনে করেনি কোনদিন!

বললো বনহুর— নীলা জানি এদের তোমরা ঘৃণা করো, কিন্তু জানো, এরা না হলে সভ্য সমাজ বলে এ দুনিয়ায় কিছু থাকতো না। এরাই সভ্য সমাজের মেরুদণ্ড।

আমি তাই এদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই নীলা।

সত্যি তোমার তুলনা হয়না মনির। তোমাকে যত দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। নীলা বনহুরের কাঁধে মাথা রাখে। ওগো! অজানার বন্ধু! তুমি কে বলো?

নীলা! আমি তোমারই মত একজন মানুষ।

তবু?

আজ নয় নীলা।

মনির! একটা কথা আমাকে বড় অস্থির করে তুলেছে। আমার আব্বু আমার কেউ নন, একথা কি সত্য?

অবিশ্বাসের কিছু নেই। কারণ, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

মনির আমি যেন ক্রমেই রহস্য জালে জড়িয়ে পড়ছি।

ভয় নেই নীলা! আমি তো তোমার পাশে আছি।

সত্যি! সত্যি বলছো মনির?

যতদিন তুমি অভিশাপ মুক্ত না হও ততদিন আমি তোমার পাশে থাকবো।

মনির।

হ্যাঁ, নীলা! তোমার সম্মুখে একটা কঠিন বিপদ এগিয়ে আসছে।

আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

সব জানতে পারবে নীলা।

কিন্তু আমি যে ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ছি।

বলেছি, যতক্ষণ তুমি বিপদ মুক্ত না হবে ততক্ষণ আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না নীলা।

বিপদ কেটে গেলেই তুমি চলে যাবে?

গাড়ির সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো বনহুর তখন আমার প্রয়োজন আর হবে না তাই চলে যাবো।

না না, আমি কোনদিন তোমাকে যেতে দেবো না। তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না মনির!

নীলা!

মনির তাহলে আমি চাই না অভিশাপ মুক্ত হতে! চাই না বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে..... বিপদ মুক্ত হলে তুমি থাকবে না। এ আমি ভাবতেও পারি না..... কান্নায় ভেংগে পড়ে নীলা।

বনহুরের মনে নীলার চোখের পানি আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে কোন জবাব দিতে পারে না।

বাড়ির ফটকে গাড়ি প্রবেশ করে।

নীলা আঁচলে চোখের পানি মুছে ফেলে।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি থামতেই বনহুর নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

নীলা নেমে আসে গাড়ি থেকে। বনহুরের দিকে এক নজর তাকিয়ে সে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

❑

রাত তখন তিনটা হবে।

গভীর রাতেও আমির আলি সাহেব তার গবেষণাগারে বসে কি যেন করছিলেন। তাঁর চারপাশে অনেকগুলো শিশিতে নীলাভ তরল পদার্থ রয়েছে। এসব নিয়েই তিনি পরীক্ষা চালিয়ে চলছেন।

কতকগুলো অদ্ভুত ধরনের যন্ত্রও রয়েছে গবেষণাগারের এক পাশে। মাঝে মাঝে এসব যন্ত্র চালু করে দেখছিলেন তিনি।

হঠাৎ একটা লাল আলো জ্বলে উঠলো। অদ্ভুত যন্ত্রগুলোর একটির মধ্যে শব্দ হতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমির আলী সাহেব প্রায় ছুটে গেলেন যন্ত্রটির পাশে। একটা সুইচ টিপে ধরলেন তিনি। অমনি সেই কণ্ঠ স্বর শোনা গেলো, ডক্টর হামবার্টের গুরুগম্ভির গলা ...খান বাহাদুর! আজকাল তোমার কাজে

অবহেলা দেখছি ....মনে রেখো, আমাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলে সমূলে ধ্বংস হবে...

আমির আলীর কম্পিত গলা... আমি মোটেই কাজে অবহেলা করছিনা..... আপনাকে ফাঁকি দেওয়াও .....আমার .....

আমির আলীর কথা শেষ হয় না! ওপাশ থেকে শোনা যায় সেই কণ্ঠ---- আমার কাছে কিছু গোপন থাকবে না .... নীলাকে তুমি যতক্ষণ না আমার হাতে তুলে দিয়েছো ততক্ষণ আমি স্বস্তি পাচ্ছি না.... হাঁ আর একটি কথা ...

বলুন...

নীলা আজকাল একটি যুবকরে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়... কে সে.... আর তার উদ্দেশ্যই বা কি...

আমির আলী আমতা আমতা করে বললেন.... ও আমার বাসায় মালির কাজ করতো..... নাম রংলাল ....

একটা অট্টহাসির শব্দ .... হাঃ হাঃ হাঃ, মালি... মালির সঙ্গে নীলাকে বেশ লাগিয়ে দিয়েছো খান বাহাদুর .... নামটাও মন্দ না, রংলাল..... কিন্তু মনে রেখো আমির আলী.... নীলাকে তুমি যার সঙ্গেই লেলিয়ে দাও আমার হাত থেকে সে পরিত্রাণ পাবেনা.... তুমিও নিঃশেষ হয়ে যাবে.... কারণ সব তুমি জানো....

আমীর আলী ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন.... আপনি যা বলেছেন, সব খেয়াল আছে চ্যাটার্যী সাহেব.... রংলাল সামান্য মানুষ। ওকে সরাতে বিলম্ব লাগবেনা.... ছেলেটা বড় কাজের তাই আমি....

ও পাশের কণ্ঠ.... তাই তুমি একটা হীন নগন্য মালির সঙ্গে মেয়েকে মিশতে দিয়েছো.... তুমি খেয়াল না করলেও.... আমি খেয়াল করেছি .... ওরা দুজনা প্রায় গাড়ি নিয়ে ... বাইরে যায় ... হাঁ নীলাকে যেন কোন কথা বলোনা... আগামী অমাবস্যায় নীলাকে নিয়ে তুমি জঙ্গল বাড়ি ঘাটিতে ... হাজির হবে..... যদি কোন রকম অবহেলা করো বা চালাকী করো... আমার হাতে চাবিকাঠি আছে .... এখানে বসে সুইচ টিপবো.... সঙ্গে সঙ্গে তোমার গবেষণাগার ধ্বংস হয়ে যাবে, তার সঙ্গে ধ্বংস হবে তুমি ....

আমির আলী সাহেবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো কিছু বলবার জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি.... একটা কথা আজ আপনাকে বলবো... স্বয়ং দস্যু...

অমনি কে যেন কাঁধে হাত রাখলো। আমির আলীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকালেন তিনি মুহূর্তে, মরার মুখের মত বিবর্ণ হয়ে উঠলো তার মুখ-মণ্ডল। দেখলেন, জমকালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি তার কাঁধে হাত রেখেছে।

ওপাশ থেকে ব্যস্ত কণ্ঠে.... খান বাহাদুর বললো স্বয়ং দস্যু .... কে কি কি বলতে চাচ্ছো বলো ...

আমির আলী একবার জমকালো মূর্তির দিকে তাকিয়ে কম্পিত গলায় বললো... বলছিলাম কোন দস্যুও পারবেনা আমার কাজে বাধা দিতে.... আমি আগামী অমাবস্যায় নীলা সহ জঙ্গল বাড়ি হাজির হবো...

ঠিক মনে রেখে কাজ করবে...

আচ্ছা সব মনে থাকবে...

লাল আলোটা নীভে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটার মধ্যে একটা কর্ কর্ কর্ কর্ শব্দ হচ্ছিলো সেটা আর শোনা গেলোনা।

জমকালো মূর্তি বললো— আপনি এই মুহূর্তে আমার কথা বলে দিতে যাচ্ছিলেন আমির আলী! বলুন সত্যি কিনা?

ভয় পাংশু মুখে আমির আলী বললেন— না।

তবে দস্যু বা কি বলছিলেন?

কোন জবাব দেননা আমির আলী সাহেব।

আমি জানি আপনি যা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যদি বলতেন তা হলে এতোক্ষণে আপনার প্রাণহীন দেহটা আপনার গবেষণাগারের মেঝেতে লুটিয়ে পড়তো?

আমির আলী সাহেব ভীত আতঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন জমকালো মূর্তির হাতের আগ্নেয় অস্ত্রটির দিকে।

জমকালো মূর্তি বললো— আবার আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কোন ক্রমে আমার নাম যেন কাউকে বলবেন না। ডক্টর হামবার্টকে তো নয়ই।

আচ্ছা আমি তাই করবো।

করবো নয় করতে হবে। আমার কথা বা আমার নাম কারো কাছে বলবেন না।

না, না, বলবো না। আমাকে মেরো না দস্যু বনহুর। আমি যে আমার প্রাণকে অনেক ভালবাসি।

শুধু আপনি নন! আপনার মত এ পৃথিবীর মানুষ সবাই নিজের প্রাণকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসে। যদি প্রাণের মায়া করেন তবে নীরবে কাজ করে যান আমি আছি আপনার সঙ্গে।

কথাটা বলে বেরিয়ে যায় বনহুর।

খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকেন তার গবেষণাগারের আসনে!

ভোর হয়ে আসে এক সময়।

নীলা পিতার কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হয়, তিনি ঘরে নেই।

নীলা চাকর বাকরকে ডাকা ডাকি শুরু করে দেয়।

সবাই এসে ঘিরে ধরে নীলাকে।

রংলালও বাদ যায় না, সেও এসে দাঁড়ায়।

নীলা ব্যস্ত কণ্ঠে বলে— আব্বুকে দেখছিনা কেনো?

একজন জবাব দেয়— মালিক তার গবেষণাগারেই আছেন।

অবাক কণ্ঠে বলে নীলা— আব্বু সমস্ত রাত আজ গবেষণাগারে কাটিয়েছেন। আশ্চর্য মানুষ তিনি। এসো রংলাল, আব্বু কি করছেন দেখে আসি।

নীলার পিছনে পিছনে চলে রংলাল।

গবেষণাগারে প্রবেশ করে নীলা বিস্ময়ে হতবাক হয়। আমির আলী সাহেব চেয়ারে বসে আছেন আড়ষ্ট হয়ে।

নীলা ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে— আব্বু? আব্বু তুমি সমস্ত রাত এখানে ছিলে?

আমির আলী সাহেবের এতোক্ষণে যেন হুস হলো তিনি বললেন এ্যাঁ। কি বললি মা? আমি আমি সমস্ত রাত গবেষণাগারে ছিলাম?

হাঁ আব্বু তুমি সমস্ত রাত এখানে কাটিয়েছো?

কাজ, কাজ করছিলাম মা।

কাজ সারাদিন, সারারাত তুমি এতো কি কাজ করো আব্বু?

তাইতো মা এতো কি কাজ করি? মা... মা নীলা।

আব্বু তোমার কি হয়েছে? এমন করছো কেনো?

কিছু না, চল, মা চল্ ঘরে যাই। আমাকে ধরতো বাবা রংলাল।

রংলাল আমির আলী সাহেবের একটা হাত ধরে।

আর এক পাশে ধরে নীলা।

চলতে চলতে বলে নীলা— তোমাকে এতো করে বললাম। রংলাল কে তোমার গবেষণাগারে নাও। ও তোমার কাজে অনেক সহায়তা করবে। হাঁ তাই নেবো মা তাই হবে। আগে অমাবস্যাটা পেরিয়ে যাক। অমাবস্যা। অমাবস্যার কি হয়েছে আব্বু? আমি কিছু বুঝতে পারছিনা।

না না কিছু না কিছু না। আমির আলী সাহেব কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

রংলাল আর নীলা দু'জনা মিলে খান বাহাদুর সাহেবকে তার নিজের ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

নীলা খান বাহাদুর সাহেবের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

রংলাল হাত দু'খানায় হাত বুলিয়ে বলে— কি হয়েছে মালিক আপনার?

আমির আলী সাহেবের দু'চোখে ভয় আর দুঃশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকান দরজা দিয়ে বাইরের দিকে। কিছু যেন বলতে চান কিন্তু বলতে পারছেন না।

রংলাল বসো— বসো আমার পাশে।

এইতো আমি আছি আপনার পাশে। বলুন কি হচ্ছে আপনার?

বুক বড় জ্বালা করছে। বুকে হাত বুলিয়ে দাও তো রংলাল।

এইতো দিচ্ছি মালিক। রংলাল আমির আলীর বুকে হাত বুলিয়ে চলে।

নীলা যেন আরষ্ট হয়ে গেছে। তার মুখখানা বড় বিপন্ন অসহায় লাগছে। আমির আলী সাহেব তাকে শিশুকাল থেকে মানুষ করে এসেছেন। তাঁকেই সে পিতা বলে জানে আজ যদিও তার মনে দ্বন্দ্ব তবু তার প্রতি ওর অসীম ভালবাসা শ্রদ্ধা আছে। হঠাৎ তার কি হলো ভেবে অস্থির হলো নীলা। তার দু'চোখে পানি ঝরে পড়তে লাগলো।

রংলাল বললো— ডাক্তার ডাকবো মালিক?

না। ডাক্তার ডেকে কি হবে! আমার কোন অসুখ হয়নি।

তবে অমন করছো কেনো আব্বু?

ও কিছু না মা। সেরে যাবে.... সেরে যাবে কিন্তু অঁ ..... ওরা আমাকে হত্যা করতে চায়।

হত্যা! তোমাকে হত্যা করতে চায়? কে কে তোমাকে হত্যা করতে চায় আব্বু?

না না, কেউ না, কেউ না..... ভয় বিহ্বল চোখে তাকায় চারিদিকে।

রংলাল তখন আমির আলীর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো, বললো, —কেউ আপনাকে মিছামিছি ভয় দেখিয়েছে। আপনি কোন কিছু ভাববেন না মালিক। আমি আছি আপনার সঙ্গে.....

এ্যাঁ.... তুমি-তুমি.... রংলাল আরও একজন আমাকে ঐ কথা বলেছে.... আমি আছি আপনার সঙ্গে .... হ্যাঁ ঐ কথাই সে বলেছে আমাকে।

কে, কে আপনাকে ঐ কথা বলেছে মালিক? বলুন আমাকে বলুন?

না না বলবোনা। বলবোনা..... রংলাল?

বলুন?

তুমি ওর নাম শুনেছো?

কার নাম আব্বু? কার কথা বলছো?

দস্যু বনহুর!

দস্যু বনহুর? এক সঙ্গে বলে উঠে নীলা আর রংলাল।

ঐ মুহূর্তে গাড়িবারান্দায় গাড়ি থামার শব্দ হলো।

উন্মুখ হয়ে সবাই প্রতিক্ষা করতে থাকে!

এমন সময় একটি লোক কক্ষে প্রবেশ করলো। তার চেহারা ঠিক বাঙ্গালী বা অবাঙালী নয়। বিদেশী তাতে কোন সন্দেহ নাই। হাতে একটি ব্যাগ, ব্যাগটি সাধারণ নয় একটু অদ্ভুত ধরনের।

আমির আলী সাহেব লোকটাকে দেখে শসব্যস্ত উঠে বসলেন। তার চোখে মুখে একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি রংলাল এবং নীলাকে সে কক্ষ ত্যাগ করার জন্য ইংগিত করলেন।

কিছুক্ষণ আমির আলী আর আগন্তুকের মধ্যে কি যেন আলাপ আলোচনা হলো তারপর বেরিয়ে গেলো লোকটা।

আমির আলী সাহেব ডাকলেন—রংলাল।

অদূরে কোথাও ছিলো ও! ব্যস্তভাবে আমির আলীর কক্ষে প্রবেশ করে, আমাকে ডাকছেন মালিক?

হাঁ শোন।

এগিয়ে এলো রংলাল।

নীলা কোথায়?

তার ঘরে চলে গেছে।

তুমি গাড়ি বের করো রংলাল। নীলার মুখে শুনেছি সুন্দর গাড়ি চালানো শিখেছো। আজ তুমি যাবে আমাকে নিয়ে।

আচ্ছা মালিক।

এই চিঠিখানা আমার কোটের পকেটে রাখো। ঐ যে খাটের পাশে কোট ঝুলছে...

রংলাল চিঠিখানা হাতে তুলে নিলো। কিন্তু সে তখন পকেটে না রেখে হাতের মুঠার আড়ালে নিজের জামার পকেটে রেখে গাড়ি বের করার জন্য চলে গেলো।

গ্যারেজে প্রবেশ করে প্রথমে পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে মেলে ধরলো চোখের সামনে। প্রথমেই নজরে পড়লো চিঠিখানার নিচের অংশ ... ডাঃ রায়, চিঠি খানা ইংরেজিতে লিখা, তাই আমির আলী সাহেব রংলালকে দিয়েছিলো ওটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে। তিনি মনে করেছিলেন রংলাল তো ইংরেজি পড়তে জানেনা ও কিছু বুঝবেনা।

রংলাল চিঠিখানা পড়ে বিস্মিত হলো, ডাঃ রায় জেল থেকে লিখেছেন—

প্রিয় খান বাহাদুর—

তোমরা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে দিব্য আরামে কাল কাটাচ্ছো আর আমি জেলে পঁচে মরছি। নীলাকে তুমি

হামবার্টের হাতে তুলে দিও। সে আমাকে উদ্ধার করে নেবে কথা দিয়েছে। জঙ্গল বাড়ি থেকে যে সুড়ঙ্গ পথটা তোমার বাড়িতে এসেছে। সেই সুড়ঙ্গ পথেই হামবার্ট আমাকে উদ্ধার করে নেবে। তুমি আজই জেলারের সঙ্গে দেখা করবে। সে যেন আমাকে কান্দাই থেকে অন্য কোন জেলে না পাঠায় সেই ব্যবস্থা করবে।"

তোমার হতভাগ্য বন্ধু
ডাঃ রায়।

কি করে ডাঃ রায় জেল থেকে এ চিঠি বাইরে পাঠিয়েছে ভেবে পায়না সে। তবে চিঠিখানা তার হাতে পড়ায় ভাল হলো। পুনরায় চিঠিখানা পকেটে রেখে গাড়ি বের করে আনলো রংলাল বেশী দস্যু বনহুর। ফিরে এলো সে আমির আলী সাহেবের কক্ষে।

আমির আলী সাহেব বললেন— গাড়ি বের করেছো রংলাল?

হাঁ মালিক করেছি।

দাও আমার কোটটা আমাকে পরিয়ে দাও।

রংলাল কোটটা হাতে নিয়ে গিয়ে পকেটে চিঠিখানা রেখে দিলো আলগোছে। তারপর কোটটা সে পরিয়ে দিলো আমির আলী সাহেবের গায়ে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন আমির আলী সাহেব। রংলাল তাকে সহায়তা করলো।

নীলা হঠাৎ পথ আগলে দাঁড়ালো— আব্বু এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

আমির আলী সাহেব বললেন— আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি মা।

এই অসুখ শরীরে তোমার বাইরে যাওয়া উচিৎ হবে না। রংলাল তুমি যাও! আব্বুকে আমি বাইরে যেতে দেবোনা।

এবার আমির আলী সাহেব বিরক্ত ভরা কণ্ঠে বললো— তুমি বুঝবে না, আমার জরুরী কথা আছে তার সঙ্গে। না গেলেই নয়....

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

সেকি মা তুমি যাবে তা কি করে হয়।

তোমার এ শরীর নিয়ে তোমাকে একা ছেড়ে দেবোনা।

একটু হেসে বললেন আমির আলী— রংলাল তো আমার সঙ্গেই যাচ্ছে।

নীলা এরপর আর কোন কথা বলে না, সরে দাঁড়ায় পথ ছেড়ে।

আমির আলী সাহেব রংলাল সহ বেরিয়ে যান।

জেলারের বাস ভবনে গিয়ে দেখা করলেন তার সঙ্গে।

কান্দাই শহরে আমির আলী সাহেবের বেশ নাম ডাক ছিলো। তাই সবাই তাকে সমিহ করতো।

জেলার সাহেব এ ব্যাপারে ভেবে দেখবেন বলে কথা দিলেন। ডাঃ রায় বয়সী মানুষ এই কারণে তাকে বাইরের কোন জেলে পাঠাতে বারণ করলেন বলেই আমির আলী সাহেব বলেছিলেন জেলার সাহেবকে।

রংলাল বেশী বনহুর যখন জেলারের বাসায় এসে উপস্থিত হলো তখন তার মনে একটা আশঙ্কা ছিলো। পুলীশ মহলের অনেকেই তার আসল রূপ চেনে কাজেই সুষ্ঠুভাবে তার আজ ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা কে জানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনহুর বিনা দ্বিধায় ফিরে এলো আমির আলীর বাস ভবনে।

আমির আলী সাহেব এসেই কন্যার ঘরে প্রবেশ করে তাকে বললেন—এই তো ভাল ভাবে ফিরে এলাম মা।

এক সঙ্গে দুপুরে খাবেন বললেন তিনি নীলাকে।

বনহুর কিন্তু সব সময় সন্ধানে রইলো। এই বাড়ির কোথাও একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে যে পথে সুদূর কান্দাই পর্বতের জঙ্গল বাড়ি ঘাটিতে গিয়ে পৌঁছানো যায়।

আজকাল আমির আলী সাহেব রংলালকে সর্বক্ষণ তার পাশে পাশে রাখেন। তার বড় ভয় দস্যু বনহুরকে, আবার সে কখন কোন মুহূর্তে এসে পড়বে কে জানে। দস্যু বনহুর তাকে বলছিলো "আমি সর্বক্ষণ আপনার সঙ্গেই আছি" কথাটা আমির আলী সাহেব এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাননি। এবং সেই কারণেই তিনি দুঃসাহসী শক্তিশালী রংলালকে নিজের সঙ্গী করে নিয়েছেন।

অবশ্য গবেষণাগারে তিনি যখন তখন রংলালকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলেন! গবেষণাগারে তিনি কাউকে নিতে রাজি নন।

রংলালকে গবেষণাগারে না নিলেও সে গবেষণাগারের অভ্যন্তরের সব খবরই রাখে। একদিন সে গোপন সুড়ঙ্গ মুখও আবিষ্কার করে ফেলে।

গবেষণাগারের মধ্যে একটি দেয়ালে এই সুড়ঙ্গ মুখ ছিলো। আমির আলী সাহেব একদিন এই পথে ভিতরে প্রবেশ করে।

রংলাল বেশী বনহুর সব লক্ষ্য করছিলো তার কাজের ফাঁকে। বৃদ্ধ আমির আলী মনে করেছিলেন, সে এদিকে মনোযোগ দেয়নি, তার কাজ সে করে চলেছে।

কিছু পরে বেরিয়ে এসেছিলেন আমির আলী সাহেব সে সুড়ঙ্গ মধ্য থেকে।

বনহুরের চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো সেই মুহূর্তে।

আমির আলী সাহেব গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন —রংলাল তুমি বড় ভাল ছেলে তাই তোমাকে আমার এতো ভাল লাগে। তুমি পারবে আমার গবেষণাগারের কাজে সাহায্য করতে?

বলেছিলো বনহুর— পারবো।

পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন আমির আলী সাহেব— সাবাস। তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেবো আরও একশ' টাকা।

খুশি হয়ে হেসেছিলো ও।

❑ আপন মনে কাজ করছিলো সেদিন বনহুর।

নীলা কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি বনহুর।

নীলা বলে—সব সময় কাজ নিয়ে মেতে আছো। একটিবার তোমার অবসর হবেনা মনির?

আংগুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় বনহুর।

নীলা নির্নিশেষ নয়নে তাকায় ওর মুখের দিকে, তারপর বলে— আজ আব্বুর কাছে তোমায় ছুটি নিতে হবে।

কেনো?

অনেক দূরে যাবো।

কোথায়?

যেখানে কাজ নেই— তুমি ব্যস্ত থাকবে না।

একটু হেসে বলে বনহুর—বেশ আমি রাজি কিন্তু....

কোন কিন্তু নয় তৈরি থাকবে আমি তৈরি হতে চললাম। নীলা চলে গেলো সেখান থেকে আজ নীলা সুন্দর করে সেজেছে।

এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে— কই হলো তোমার?

বনহুর পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মুখমণ্ডল মুছে নিয়ে বললো— চলো।

নীলা আর বনহুর যখন গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো তখন খানসামা হাসান তীক্ষ্ম নজরে লক্ষ্য করছিলো। বনহুর আর নীলার গাড়িতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে সে তার নিজস্ব কক্ষে চলে গেলো এবং একটা ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্র বের করে সব কথা সে জঙ্গল বাড়ি ঘাটিতে জানিয়ে দিলো।

জঙ্গল বাড়ি থেকে আদেশ এলো.... হাসান তুমি তোমার আত্ম গোপনকারী গুপ্তাদ্দলকে জানিয়ে দাও। যেখানে ওরা যাবে যেন ফলো করে এবং ফেরার পথে গাড়ি আটক করে রংলালকে হত্যা করে ফেলে। নীলাকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলবে তারপর তাকে বাসায় পৌঁছে দেবে। রংলালকে হত্যা করতে পারলে তোমার কাজে উন্নতি হবে মনে রেখো...

এখানে যখন ছদ্মবেশী খানসামা ওয়্যারলেসে কথা বলছে তখন বনহুর আর নীলা সচ্ছমনে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজ নীলা বললো— চলো কান্দাই নদীর ধারে যাবো। আজ বহুদূরে চলো। শহরের কোন কোলাহল আমাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করবেনা।

বেশ কটাদিন ওরা বাইরে বের হয়নি তাই মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিলো, বললো বনহুর— বেশ চলো, বনহুর গাড়ির গতি কান্দাই নদীর পথে ফিরিয়ে নিলো।

নীলাকে আজ বড় আনন্দমুখর লাগছে।

বনহুর আপন মনে গাড়ি চালিয়ে চলেছিলো দৃষ্টি তার সম্মুখের পথে।

নীলা মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলো বনহুরকে।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মদু হাসির রেখা লেগেছিলো।

শহর ছেড়ে নির্জন পথে গাড়ি চলতে শুরু করলো।

এই পথই কান্দাই নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছেছে।

বনহুর বা নীলা কেউ লক্ষ্য করেনি তাদের গাড়িখানাকে ফলো করে একটা বড় গাড়ি এগিয়ে আসছে। গাড়িখানা অবশ্য অনেক অনেক দূরে রয়েছে যাতে ওরা টের না পায়। গাড়িতে বেশ কিছু সংখ্যক লোক সূতীক্ষ্ম ধার ছোরা নিয়ে বসে আছে। চোখে মুখে তাদের হিংস্রতার ছাপ।

গাড়িখানা আরও কিছু অগ্রসর হবার পর একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। নেমে পড়লো গাড়ির লোকগুলো এক এক জনের ভীষণ চেহারা, পরনে প্যান্ট গায়ে ডোরা কাটা গেঞ্জী কোমরের বেলটে সূতীক্ষ্ম ধার ছোরা ঝুলছে।

লোকগুলো গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির চারপাশে জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়লো। আত্মগোপন করে বসে রইলো তারা। নীলা আর রংলাল—এর গাড়ি এলে আক্রমণ চালাবে। এক এক জনের চোখগুলো ক্রুদ্ধ শার্দ্দুলের মত জ্বলছে।

নির্জন নদীর তীরে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর নীলা।

বেলা শেষের অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ আলোকরশ্মি নদীর রূপালী জলে অপূর্ব শোভা বিস্তার করেছিলো। কতকগুলো নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে কোন অজানা পথে।

নীলা বললো— জানো কেনো তোমাকে নিয়ে এলাম আজ এখানে?

আমি জ্যোতিষী নই নীলা বুঝবো কেমন করে।
সত্যি তুমি.... না থাক বলবোনা।
বলো আমি কি?
বোকা।
একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করার ভান করে বলে বনহুর —সবাই আমাকে বোকা বলে, তাইতো আমার এতো আফসোস নীলা।
তাই নাকি?
হাঁ।
শোন মনির, তুমি আমার কাছে যতই নিজেকে বোকা সাজিয়ে রাখো আমি জানি তুমি কত বুদ্ধিমান।
তাতো বুঝলাম কিন্তু আজ আমাকে এখানে নিয়ে আসার কারণটা কি বুঝতে পারলাম না?
তোমাকে শপথ করতে হবে।
শপথ?
হাঁ।
কিসের শপথ নীলা?
আমাকে তুমি নিজের করে নেবে—কথা দাও?
নীলা!
না হলে আমি আর ফিরে যাবোনা।
বনহুরের দু'চোখে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ে।
নীলা বলে— এই নদী বক্ষে আমি নিজকে বিসর্জন দেবো।
এ জন্যই তুমি আজ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো—
তাছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমি জানি তুমি একদিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।
তাই এই নির্জন নদী তীর তোমার পছন্দ...
যদি মনে করো তবে তাই....এখানে ছাড়া তোমাকে এমন নিবিড় করে পাবোনা জানতাম।
নীলা তুমি এখনও আমার আসল পরিচয় জানোনা। আমি কে; কি আমার পেশা! কোথায় আমি থাকি.....
ওসব কিছু আমি জানতে চাই না মনির। তুমি আমার অজানা অচেনা বন্ধু এই তো তোমার পরিচয়!
নীলা! আমাকে ভাববার সময় দাও।
না না, তুমি আমাকে কথা দাও! কথা দাও মনির...

কিন্তু আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আমি তোমায় কথা দেবো নীলা।

সত্যি!

হাঁ সত্যি।

নীলা বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে— তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবোনা মনির।

বনহুরের মুখমণ্ডলে একটা গভীর চিন্তা রেখা ফুটে উঠে। সে ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলে— নীলা চলো এবার আমরা ফিরে যাই! একি আবার তোমার চোখে পানি! তুমি কাঁদছো?

তোমার মত পাষাণ হৃদয় পুরুষ আর নেই।

মিথ্যা বলোনি নীলা। এ অপবাদ আমার আছে। নীলা একটা গান শোনাবেনা আজ? নির্জন নদীর তীরে তোমার গানের সুর দোলা জাগাবে।

নীলা নত মুখে বসে রইলো।

বনহুর নীলার মুখখানা তুলে ধরলো— নীলা!

বলো?

একটা কথা বলবো?

বলো?

তুমিই একদিন বলেছো, কে যেন তোমার কাছ থেকে তোমার রত্ন ছিনিয়ে নিতে চায় এসব জেনেও তুমি নিজকে বিপন্ন করতে চাও?

না না ও কথা তুমি মুখে এনোনা। আমি— আমি তাকে চিনিনা! আমি তাকে ভয় করিনা মনির। সে যা চায় আমি তাই দেবো তবু আমি তার কাছে ভিক্ষা চেয়ে নেবো তোমাকে..... বনহুরের কোলে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেংগে পড়ে নীলা।

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে থাকে বনহুর, এ কান্না সে বহু দেখেছে। তাকে যে ভাল বেসেছে সেই শুধু কেঁদেছে। নীলা যে কাঁদবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নীলাকে স্বচ্ছ করে তোলার চেষ্টা করে বনহুর, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে— এ ভাবে কাঁদলে আমি আর আসবোনা নীলা। ভেবেছিলাম তুমি আমায় একটা নতুন গান শোনাবে।

তবু নীলা ফুলে ফুলে কাঁদে।

বনহুর বলে আবার— এতো সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করে দিলে তো! উঠো নীলা, চেয়ে দেখো কত সুন্দর ঐ নদীর পানি.....

নীলা উঠে বসলো।

বনহুর নিজের হাত দিয়ে নীলার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললো— কি সুন্দর দৃশ্য। একটা গান গাও নীলা। আজকের সন্ধ্যাটা সার্থক হোক।

আজ গাইতে পারবো না মনির।

কেনো?

মনটা বড় অস্থির লাগছে।

ও কিছুনা নীলা তুমি গাও। সত্যি তোমার গান আমার বড় ভাল লাগে।

মনির...

ভুলে যাও নীলা সব ব্যথা-বেদনা।

কি জানি কেনো আমার বুকটা দুরু দুরু কাঁপছে; হঠাৎ যদি সে এসে পড়ে তাহলে?

কার কথা বলছো নীলা?

ও নাম মুখে আনতে চাইনা।

বুঝেছি, দস্যু বনহুরের কথা বলছো নীলা?

সত্যি ও নাম ভয়ঙ্কর...

হঠাৎ অট্টহাসিতে ভেংগে পড়ে বনহুর। নির্জন নদীতীর যেন কেঁপে উঠে।

নীলা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে। বনহুরের হাসি থেমে যায়। নীলা বলে— থামলে কেনো আরও হাসো। সত্যি তুমি যখন হাসো তোমাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগে।

তাই নাকি?

হাঁ- তুমি অপূর্ব মনির।

নীলা! বনহুর নীলাকে ধরে ফেলে গভীর আবেগে। সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দেয় ওকে, তারপর বলে— কই গান গাইবে না?

হাঁ গাইবো। লজ্জাতুর ভাবে বলে নীলা।

ঐ গানটা গাও নীলা যে গান তুমি সেদিন গেয়েছিল।

বেশ তাই গাইছি।

নীলা গান গায়।

বনহুর অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে মোহমুগ্ধের মত।

গান গাওয়া শেষ হলে বলে বনহুর— চলো নীলা এবার ফিরে যাই?

চলো।

নীলা আর বনহুর উঠে দাঁড়ায়।

গাড়ির পাশে ফিরে আসে তারা।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে। চারিদিকে অন্ধকার ক্রমে জমাট বেঁধে উঠেছে।

বনহুর ড্রাইভ আসনে তার পাশে নীলা।

ওদিকে জঙ্গলে আত্মগোপন করে প্রতিক্ষা করছে গুণ্ডা দলটি।
গাড়ির শব্দ পেয়ে ওরা তটস্থ হয়ে উঠে।
প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ায় সবাই, ছোরাগুলো খুলে নেয় খাপ থেকে।
বনহুর আর নীলার গাড়ি এগিয়ে আসছে!
সার্চ লাইটের আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার উপর।
হঠাৎ বনহুর বলে উঠে— নীলা বিপদের জন্য প্রস্তুত হও.....
সে কি! ভয়ার্তকণ্ঠে বললো নীলা।
বনহুর ব্যস্ত গলায় বললো— সামনে তাকিয়ে দেখো...
নীলা ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বললো— ওকি রাস্তা বন্ধ কেনো? কারাপথের মধ্যে বাঁশ দিয়েছে?
নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু হবে.... বনহুরের কথা শেষ হয়না জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বিশ বাইশ জন জোয়ান পুরুষ।
সম্মুখে রাস্তা বন্ধ।
বনহুর বাধ্য হলো গাড়ি থামিয়ে ফেলতে।
সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চারপাশে ঘিরে গাঁড়ালো একদল লোক। কি ভয়ঙ্কর চেহারা এক একজনের। হাতে সবার সূতীক্ষ্ণধার ছোরা।
বনহুর হঠাৎ এমন একটা অবস্থার জন্য একটুও ঘাবড়ে গেলো না। সে নীলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো।
ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে নীলার মুখ!
বনহুর দ্রুত কণ্ঠে বললো— গাড়ি থেকে নেমোনা নীলা.... কথাটা বলেই বনহুর গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।
ততক্ষণে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুর্ধর্ষ দল। বনহুর কৌশলে শয়তানদের ছোরা থেকে নিজকে বাঁচিয়ে সরে দাঁড়ালো এবং সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচণ্ড ঘুষি চালিয়ে চললো।
সমস্ত শয়তান মিলে আক্রমণ চালিয়ে চলেছে। একা বনহুর পেরে উঠা মুস্কিল। তবু সে তার বজ্র মুষ্ঠিতে এক একজন দুর্ধর্ষকে ধরাশায়ী করে চলেছে।
ভীষণ লড়াই চললো।
নীলা কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা, সে ভাবছে দস্যু বনহুর তার দলবল নিয়ে রংলালকে হত্যা করার জন্যই আক্রমণ চালিয়েছে।
অল্পক্ষণেই নীলা আশ্চর্য হয়ে যায়। দেখতে পায় দুর্ধর্ষ শয়তানের দল কে কোন দিকে পালাচ্ছে। কয়েকটা রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে গাড়ির পাশে।
বনহুর এগিয়ে আসে হাতে তার একখানা রক্ত মাখা ছোরা।
নীলা গাড়ি থেকে নেমে ঝাপিয়ে পড়ে ওর বুকে— মনির।

হঠাৎ ওর দেহের দিকে নজর পড়তেই শিউরে উঠে নীলা। সমস্ত জামা রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

নীলা ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখলো ওর মাথার মধ্য থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কপালে মুখে চোখে আর জামায়।

নীলা আর্তনাদ করে উঠে— মনির..

বনহুর শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে— ও কিছু না নীলা। চলো, গাড়িতে চলো! ছোরাখানা ছুড়ে ফেলে দিলো সে।

নীলা গাড়িতে চেপে বসে।

বনহুর ড্রাইভিং আসনে বসলো কিন্তু সমস্ত চোখে মুখে রক্তের বন্যা ঝরে পড়ছে যেন।

নীলা ব্যাকুল কণ্ঠে বললো— তুমি গাড়ি চালাতে পারবে তো?

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুখের রক্ত মুছে নিলো বনহুর।

গাড়ি উলকা বেগে ছুটে চলেছে।

নীলা শুধু বিস্মিত হতবাকই হয়নি তার হৃদয় অভূতপূর্ব আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছে। এতো দুঃখ ব্যথার মধ্যেও খুশির উচ্ছ্বাস। তার মনির এতোগুলো দুর্ধর্ষকে পরাজিত করেছে।

নীলা অবাক চোখে প্রাণ ভরে ওকে দেখছে।

নিজের আঁচল দিয়ে ওর রক্ত মুছে দিচ্ছিলো সে বার বার।

গাড়িবারান্দায় গাড়ি পৌঁছতেই সর্ব প্রথম এসে দাঁড়ালো খান বাহাদুর সাহেবের পুরোন খানসামা হাসান। রংলালকে ড্রাইভিং আসনে দেখে সে প্রথমে হকচকিয়ে গেলো। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ হাসান জানে আজ রংলালের মৃত্যু সুনিশ্চিত। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে নীলার সংজ্ঞাহীন দেহটা গাড়ি থেকে নামিয়ে নেবে বলে।

হাসান থ মেরে দাঁড়িয়ে আছে।

নীলা বললো— দেখছো কি? শীগগীর আব্বুকে ডেকে আনো।

হাসান ছুটলো খান বাহাদুর সাহেবকে ডাকতে।

ততক্ষণে অন্যান্য লোকজন ছুটে এসে গাড়িখানাকে ঘিরে ফেলেছে। শসব্যস্তে ছুটে এলেন খান বাহাদুর সাহেব। বনহুরকে রাক্তাক্ত অবস্থায় দেখে তিনি হায় হায় করে উঠলেন। নিজ হাতে তিনি ওকে ধরে নিয়ে চললেন ওর ঘর অভিমুখে।

সবার মুখে এক কথা কেমন করে এ অবস্থা হলো।

নীলা শুধু একবার বলেছিলো— দস্যু বনহুরের দল রংলালকে হত্যা করতে চেয়েছিলো..... এর বেশি সে আর কিছু বলেনি।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এলেন।

খান বাহাদুর আমির আলী সাহেবের নিজস্ব ডাক্তার হোরিস্‌স্মিথ।

তিনি এসে বনহুরের অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হলেন কারণ ওর মাথার ক্ষতটা অত্যন্ত গভীর হয়েছিলো। তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন বটে কিন্তু বললেন—কিছুটা রক্তের প্রয়োজন।

খান বাহাদুর সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। এ সময়ে হঠাৎ কোথায় তিনি রক্ত পাবেন।

নীলা এগিয়ে এলো— ডাক্তার স্মিথ আমি রক্ত দেবো।

অবাক চোখে তাকালেন ডাক্তার স্মিথ নীলার দিকে। রংলাল চাকর বইতো নয় তার জন্য নীলা নিজে রক্ত দেবে।

নীলা বুঝতে পারলো ডাক্তার স্মিথের মনোভাব। সে বললো— আপনি বিলম্ব করবেন না ডাক্তার স্মিথ। ও যেন সুস্থ হয়ে উঠে এই কাজ করুন।

খান বাহাদুর আমির আলী কন্যার কথাটা সম্পূর্ণ ফেলতে পারলেন না। কারণ রংলালকে নীলাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো।

নীলার কথাটা অবশ্য বনহুর শুনতে পায়নি। কারণ ডাক্তার স্মিথের সঙ্গে অপর এক কক্ষে এসব আলাপ আলোচনা চলছিলো।

ডাক্তার স্মিথ নীলার শরীর থেকে রক্ত নিয়ে বনহুরের শরীরে পুশ করলেন।

তখন খানসামা হাসান সব লক্ষ্য করছিলো। হাসান নানা কাজের ফাঁকে দেখছিলো সব কিছু। নীলা যে রংলালের জন্য রক্ত দিলো এ সংবাদ হাসান সঙ্গে সঙ্গে সুদূর জঙ্গলবাড়ি ঘাটিতে পৌঁছে দিলো তার ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্রের মাধ্যমে।

জঙ্গলবাড়ি ঘাটির মালিক হামবার্ট চাটার্যী যখন শুনলো রংলাল নিহত হয়নি এবং তার জন্য নীলা নিজ শরীরের রক্ত দিয়েছে তখন সে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। তৎক্ষণাৎ তার দলবলকে ডেকে পাঠালেন।

বনহুরের কাছে ভীষণভাবে মার খেয়ে হামবার্টের দল মৃতবৎ হয়ে পড়েছিলো। মালিকের আহ্বানে না গিয়ে পারলো না তারা।

হামবার্ট তাঁর জঙ্গল বাড়ি বাটির এক গোপন গুহায় পায়চারী করছিলো। সমস্ত শরীরে তার অদ্ভুত পোশাক। এ পোশাক সে সর্বক্ষণ পরে থাকে। গণ্ডারের চামড়া দিয়ে এ পোষাক তৈরি কাজেই এই পোশাক পরা অবস্থায় তার দেহে কোন গুলি বা ছোরা বিদ্ধ হয় না।

হামবার্ট অত্যন্ত সুচতুর আর হিংস্র।

বয়স তার পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু চেহারায় কোন বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। একটি জীবন্ত শয়তান বলেই মনে হয় তাকে। চোখ দুটো ক্ষুব্ধ শার্দুলের মত। মাথায় চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাটা। দাঁতগুলো বেশ বড়

আর লালচে ধরনের। সবচেয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণীয় সে হলো তার বাম পা। দেহের চেয়ে ওর বাম পা টি অত্যন্ত খাটো ছিলো।

পায়চারী বন্ধ করে ফিরে তাকায়।

তার প্রধান সহকারী জাহাঙ্গীর হিথ এসে দাঁড়ালো তার পিছনে। ক্ষত বিক্ষত আহত অবস্থায় সেই শয়তানগুলো এসে দাঁড়িয়েছে যারা গত সন্ধ্যায় আক্রমণ চালিয়েছিলো বনহুর আর নীলার উপর।

গর্জে উঠে শয়তান হামবার্ট —অপদার্থের দল তোমরা এতোগুলো জোয়ান একজন লোককে কাবু করতে পারলে না।

সমস্ত জোয়ান তখন কাঁপছে থরথর করে।

হামবার্টের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। সে টেবিল থেকে মেশিনগান তুলে নিয়ে ব্রাস ফায়ার করলো। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো আহত জোয়ানগুলো।

রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠলো জঙ্গল বাড়ি ঘাটির পাথুরে মেঝে।

হামবার্ট তার সহকারী হিথকে নির্দেশ দিলো— লাশগুলো পর্বতের নিচে ফেলে দাও। যতসব জঞ্জাল।

হিথ আদেশ পালন করার জন্য বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো হিথ সঙ্গে কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক। তারা মৃত দেহগুলো ধরাধরি করে নিয়ে চললো।

হামবার্ট তার সহকারীকে বললো— শুনলাম রংলাল বেশ জখম হয়েছে। তার শরীরে রক্ত প্রয়োজন হওয়ায় নীলা নাকি রক্ত দিয়েছে। নীলার দরদ কত বুঝতেই পারছো, ওর জন্য নিজের রক্ত সে দিলো।

সব আমি শুনেছি মালিক।

হাসানকে জানিয়ে দাও ডাক্তার স্মিথকে সাবধান করে দিতে। সে যেন কোন ক্রমে ইন্‌জেকশানে বিষ মিশিয়ে রংলালের শরীরে পুশ করে। যদি না করে তা হলে আমার হাত থেকে সে রেহাই পাবে না। হিথ তুমি এক্ষুণি ওয়্যারলেসে জানিয়ে দাও।

আচ্ছা মালিক।

শোন আর একটি কথা, ডাঃ রায় আমির আলীকে বলে দিয়েছে তার কন্যা নীলাকে আমার হাতে তুলে দিতে। তাকে আমি কান্দাই জেল থেকে সুড়ঙ্গ পথে উদ্ধার করবো বলে আশ্বাস দিয়েছি। ডাঃ রায় মুক্ত না হলে আমাদের ব্যবসা শিথিল হয়ে আসছে। সে একাই প্রতিমাসে একশত থেকে দু'শত পাউণ্ড রক্ত এবং দুইটি আই ব্যাঙ্ক নর চক্ষু দিতো। কান্দাই থেকে ব্যবসা তুলে নিতে হচ্ছে শুধু ডাঃ রায় না থাকায়।

কথাগুলো বলে থামলো হামবার্ট।

এমন সময় ছুটে এলো একটি লোক, সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো— উড়ন্ত ভিপসা এসেছে স্যার।

হামবার্ট চঞ্চল হয়ে উঠলো— এবার নিয়ে তিনবার আমি এদের ফিরিয়ে দিলাম হিথ। বিশ লক্ষ টাকার মাল ওরা আমাদের জঙ্গল বাড়ি ঘাটি থেকে পাবে।

হিথ- এর মুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো।

হামবার্ট লিফটে চেপে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে লিফট উপরে উঠে এলো। একটি সুড়ঙ্গ পথ। ঐ সুড়ঙ্গ পথে একটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো। হামবার্ট গাড়িতে চেপে বসলো।

অল্পক্ষণেই গাড়ি সুড়ঙ্গ পথের বাইরে এসে পড়লো। সবুজ ঘাসে ঢাকা বিস্তৃত প্রান্তর!

একটি অদ্ভুত গাড়ি অপেক্ষা করছে সেখানে।

গাড়ির ড্রাইভারের দেহে অদ্ভুত পোশাক। যে ধরনের পোশাক পরে ডাঃ রায় তার হত্যালীলা চালাতো। এই লোমশ দেহী লোকটা হামবার্টকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। সাংকেতিক ভাষায় কি যেন সব আলাপ করলো ওরা দু'জনা।

লোকটা গাড়িতে উঠে বসলো তারপর গাড়ি ছুটলো। কিছুদূর অগ্রসর হতেই গাড়ির দু'পাশ থেকে বেরিয়ে পড়লো দুটি পাখা। এবার গাড়িখানা প্লেনের মত আকাশে উড়ে উঠলো।

হামবার্ট ফিরে এলো তার সুড়ঙ্গমধ্যে গাড়িখানার পাশে। এ গাড়িখানাও ছিলো বিস্ময়কর। গাড়িতে চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করে এবং ঠিক জায়গায় এসে থেমে যায়।

হামবার্ট অল্পক্ষণে পৌঁছে গেলো তার জঙ্গলবাড়ি ঘাটির নির্দিষ্ট গুহায়। সমস্ত গুহায় নানা ধরনের যন্ত্রপাতি আর ডায়নামা ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত মেশিন সাজানো রয়েছে। এখানেই রয়েছে নানা রকম সুইচ। এমন একটি সুইচ আছে যাতে চাপ দিলেই কান্দাই শহরে আমির আলীর গবেষণাগার ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু তাই নয় একটি ভয়ঙ্কর মেশিন আছে যা চালু করলে সঙ্গে সঙ্গে একটি দুর্গম সুড়ঙ্গ পথের সৃষ্টি হবে।

হামবার্ট ডাঃ রায়কে জেল থেকে বের করার জন্য এ মেশিন ব্যবহার করবে। এ ছাড়াও আরও কতকগুলো ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত মেশিন আছে যা অতি সাংঘাতিক মারাত্মক।

হামবার্ট-এর আদেশ তার সহকারী হিথ খানসামা হাসানকে জানিয়ে দিলো।

ঐ মুহূর্তে নীলা হাসানের কামরার পাশ কেটে রংলালের কামরায় যাচ্ছিলো হঠাৎ তার কাছে ভেসে এলো চাপা অস্পষ্ট একটি কণ্ঠস্বর ... হাসানের গলা, ডাক্তার স্মিথ আজ বৈকালে আসবেন বলে গেছেন। হাঁ কি বলবো তাকে .... আচ্ছা বিষ ইনজেকশানে মিশিয়ে রংলালের শরীরে পুশ করতে .... হাঁ ঠিক বুঝেছি... ডাক্তার স্মিথ এলে তাকে... আচ্ছা তার বাসায় যাবো... হাঁ এক্ষুণি তাকে জানিয়ে দেবো আপনার আদেশ..

নীলার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে উঠলো।

সে বুঝতে পারলো রংলালকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। তাকে সেদিন সন্ধ্যায় হত্যা করতে চেষ্টা করা হয়েছিলো কিন্তু তা সম্ভব হয়নি তাই ডাক্তার স্মিথের দ্বারা তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হবে। কে সেই ব্যক্তি যে এই হত্যা চক্রান্তের অধিনায়ক। তবে হাসান তার হয়ে কাজ করছে। নীলার মুখ রক্তাভ হয়ে উঠে। এই মুহূর্তে সে হাসানকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না। নীলা ধীরে ধীরে কাজ করবে। সর্বক্ষণ সে রংলালকে চোখে চোখে রাখবে...

হাসানের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিলো নীলা বুঝতে পারে সে এখন বেরিয়ে আসবে তাই তাড়াতাড়ি সরে পড়ে সেখান থেকে।

বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পায় নীলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। নীলা এসে বসলো তার পাশে, অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো ওর অসুস্থ মুখের দিকে। বড় মায়া হলো নীলার কারণ সেই তাকে কাল সন্ধ্যায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো না হলে ওর এ অবস্থা হতোনা।

ডাক্তার নীলার শরীর থেকে রক্ত নিয়ে ওর শরীরে দিয়েছে, বলেছেন ভয়ের কোন কারণ নাই। এবার সুস্থ হবে সে। নীলার চোখ দু'টো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু এই মুহূর্তে মনটা তার একেবারে বিষণ্ন হয়ে যায়। ওকে কি করে রক্ষা করবে।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে নীলা।

ঘুম ভেংগে যায় বনহুরের। চোখ মেলতেই ও দেখতে পায় নীলা কাঁদছে?

বনহুরের কণ্ঠ-স্বরে ওর কান্না আরও বেড়ে যায়। উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদে সে।

এমন সময় হাসান এক গেলাস দুধ এনে পাশে দাঁড়ায়— এই নাও রংলাল তোমার দুধ।

নীলা চোখ তুলে তাকায় হাসানের দিকে তারপর গম্ভীর গলায় বল্লে— তুমি যাও হাসান আমি ওকে দুধ খাইয়ে দেবো।

হাসান বিরক্ত হয় দুধের গেলাসটা সে টেবিলে রেখে বেরিয়ে যায়।

নীলা এবার দুধের গেলাসটা তুলে নেয় হাতে তারপর পাশের জানালা দিয়ে সব দুধ ফেলে দেয় বাইরে।

অবাক হয়ে যায় বনহুর।

নীলা শূন্য গেলাস হাতে ফিরে আসে বনহুরের শয্যার পাশে।

অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর— দুধটা অমন করে ফেলে দিলে কেনো নীলা?

দুধ আমি নিজে তোমায় এনে দেবো মনির! আজ থেকে আমি তোমায় খাইয়ে দেবো।

নীলা তুমি আমার জন্য কত করছো। শুনলাম তুমি রক্ত দিয়েছো আমার শরীরে...

মনির তোমার শরীরে আমার রক্ত দিতে পেরেছি বলে আমার কি যে আনন্দ তুমি তা বুঝবেনা! সত্যি তোমার এই ঘটনার জন্য আমিই দায়ী কারণ আমি তোমায় সেদিন নিয়ে গিয়েছিলাম। না হলে আজ তোমার এ অবস্থা ঘটতো না।

হাসে বনহুর—নীলা আমার অদৃষ্টে যা ছিলো তাই হয়েছে। এর জন্য তুমি কেনো দায়ী হবে।

তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারবো মনির। দস্যু বনহুর বলেছিলো সে আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেবে তাই সে তোমাকে গত সন্ধ্যায় হত্যা করতে গিয়েও পারেনি এবার কৌশলে তোমাকে সে হত্যা করবে...

দস্যু বনহুর!

হাঁ সে বলেছিলো তোমাকে যেন আমি ভাল না বাসি। তোমাকে যেন ভুলে যাই.... মনির আমি তো বলেছি তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। এবার দস্যু বনহুর এলে বলবো— তুমি ওকে হত্যা না করে আমাকে করো... রাম্পরুদ্ধ হয় নীলার কণ্ঠস্বর। ছুটে বেরিয়ে যায় নীলা।

একি এক মহা সমস্যা, তাকে যে নীলা গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে। নীলাকে সে কি করে বোঝাবে সে যা চায় তা কোনদিনই সম্ভব নয়। নীলা ওকে নিজের করে পেতে চায়। এর পরিণতি কি হবে ভাবতে গিয়ে ওর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠে।

এমন সময় নীলা এক গেলাস দুধ নিয়ে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে বনহুর তখন চোখ বুঝে পড়েছিলো।

ভাবছিলো নীলার কথা, ভাবছিলো গত রাতের কথা। তাকে হত্যা করার জন্য ভীষণভাবে চেষ্টা চলেছে। নিশ্চয়ই একটা দল তাকে সর্বক্ষণ ফলো করছে। কিন্তু তার আসল পরিচয় তারা জানে না। জানলে ওভাবে আক্রমণ চালাতে সাহসী হতো না। নীলার মনে সন্দেহ দস্যু বনহুর তার রংলালকে

তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায় মানে হত্যা করতে চায়। নীলার ভাবাটা অহেতুক নয় সে নিজেই এর জন্য দায়ী। নীলাকে নানাভাবে ভয় দেখিয়েও নীলার মন থেকে বনহুর রংলালকে সরাতে পারেনি...

নীলার উপস্থিতিতে বনহুরের চিন্তা ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বলে নীলা— দুধ খাও।

নীলা!

হাঁ একটু মাথা তোলো। নীলা বনহুরকে তুলে ধরে বাম হাতে আর ডান হাতে দুধের গেলাস ধরে তার মুখে।

বনহুর দুধ টুকু পান করে।

হাসান আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করলো।

নীলা কিন্তু সর্বক্ষণের জন্য ওর পাশে পাশে রয়েছে। এক মুহূর্ত সে বাইরে যায় না।

হাসান এলে বলে— তুমি যাও হাসান আমি আছি।

হাসান বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

এক সময় ডাক্তার স্মিথ এলেন।

নীলার মুখ খানা কঠিন এবং গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার স্মিথের সঙ্গে আমির আলী সাহেবও সেই কক্ষে এসেছেন রংলালকে দেখতে।

হাসান এসে দাঁড়ালো পাশে।

ডাক্তার স্মিথ যখন ইনজেকশান তৈরি করে নিচ্ছিলেন তখন নীলা বললো— না ওকে ইনজেকশান দেওয়া হবে না।

কক্ষ মধ্যে সবাই অবাক হয়ে গেলো!

আমির আলীর সাহেব বললেন— সেকি মা ওর যে ইনজেকশান দরকার।

হোক তবু আমি ইনজেকশান ওকে নিতে দেবো না।

বনহুরের চোখে মুখেও বিস্ময় ফুটে উঠে। হঠাৎ নীলা এমন করছে কেনো ভেবে পায়না সে।

ডাক্তার স্মিথ বললেন— ইনজেকশান না নিলে রোগী সুস্থ্য হবে কি করে?

সুস্থ্য হয়ে আর কাজ নেই ডাক্তার সাহেব আপনি যেতে পারেন।

অবাক হয়ে বলেন আমির আলী সাহেব— তুমি কি পাগল হলে নীলা। রংলাল যেভাবে আহত হয়েছে তাতে তার রীতিমত চিকিৎসার দরকার!

আব্বু আমি জানি ওর জন্য কি দরকার আর কি না দরকার।

ডাক্তার স্মিথের মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠেছে তিনি তার ঔষধের বাক্স পুনরায় গুছিয়ে নিলেন। একবার ডাক্তার স্মিথ হাসানের মুখে তাকিয়ে দেখে নিলেন তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

আমির আলী সাহেব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললেন— একি করলি নীলা। ডাক্তার স্মিথ যে চলে যাচ্ছে?

ওকে যেতে দাও আব্বু।

ডাক্তার স্মিথ চলে গেলেন।

হাসানও সেই সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করলো।

আমির আলী সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন— রংলাল সুস্থ্য না হলে অসুবিধা আছে নীলা।

আব্বু তোমার কিছু ভাবতে হবে না আমি ওর জন্য অন্য ডাক্তার ডাকবো

কি জানি মা তুই যা ভাল বুঝিস কর। বেরিয়ে গেলেন আমির আলী সাহেব।

নীলা বসলো ওর পাশে বুকে হাত বুলিয়ে বললো— আমি এক্ষুণি অন্য ডাক্তার ডাকছি তুমি কিছু ভেবোনা মনির।

কিন্তু তুমি ডাক্তার স্মিথকে ওভাবে কেনো বিদায় করলে নীলা?

এখন তুমি অসুস্থ্য। সুস্থ্য হয়ে উঠো তোমায় সব বলবো। মনির— দিন দিন আমি তোমাকে নিয়ে বড় চিন্তায় পড়েছি। তুমি জানোনা কত বড় এক চক্রান্ত চলছে তোমাকে হত্যা করার জন্য.....

আমি জানি নীলা।

তুমি জানোনা ডাঃ স্মিথ আজ তোমাকে যে ইনজেকশান করতে যাচ্ছিলেন তা বিষাক্ত পয়জোন।

নীলা।

হাঁ মনির আমি সেই কারণেই তাকে বিদায় দিলাম।

বনহুর নীলার একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরলো, তুমি সত্যি মহিয়সী নারী। আমাকে তুমি বাঁচালে.....

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাকে বাঁচাতে পারবো কিনা কে জানে। চলো মনির এ বাড়ি থেকে আমরা কোথাও চলে যাই?

নীলা তা হয় না।

কেনো? কেনো হয় না।

বনহুর নীরব।

নীলা ওর মুখে গালে হাত বুলিয়ে বলে, বলো মনির, কেনো হয় না।

আমিকে তুমি আজও জানো না নীলা। একজন অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি আমি—

তুমি আমার কাছে অপরিচিত নও। তোমার যতটুকু আমি জেনেছি এটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নীলা বনহুরের বুকে মাথা রাখে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হাসান আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করে।

বনহুরও মাথায় হাত বুলিয়ে বলে— তোমাকে বলেছি নীলা আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত ধৈর্য ধরো। আমি তোমাকে সেদিন সব বলবো। কথা দেবো তোমাকে—

আর কত দিন তুমি আমাকে দূরে দূরে রাখবে বলো! মনির আমি তোমাকে নিজের করে পেতে চাই। তোমাকে স্বামী রূপে পাবো এই তো আমার কামনা— কথাগুলো বলে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠে নীলা। বেরিয়ে যায় সে ঐ কক্ষ থেকে।

পাশের কক্ষে গিয়ে ডাক্তারকে ফোন করে নীলা।

একটু পরে ডাক্তার আসেন। তাদের নিজস্ব ডাক্তার স্মিত নয়। শহরের নাম করা বড় ডাক্তার।

নীলা পাশে বসে বনহুরের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করে।

ডাক্তার কথা দেন— আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিস নীলা। ওর চিকিৎসা আমি ভালভাবে করবো।

ডাক্তার রোজ দু'বেলা দু'বার আসতে শুরু করে।

নীলা করে ওর সেবা যত্ন।

বনহুর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে।

একদিন বলে বনহুর নীলা তুমি আমার জন্য অনেক করলে তোমার এ ঋন কোনদিন পরিশোধ করতে পারবোনা।

নীলা একটু হেসে বললো— তোমার জন্য যা করছি তা মেয়েদের কর্তব্য। বেশি কিছু করিনি মনির।

বনহুর আর নীলার যখন কথা হচ্ছিলো তখন আড়ালে আত্মগোপন করে দেখছিলো খানসামা হাসান।

নীলা বললো— জানো আজ আমার কত আনন্দ হচ্ছে। তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছো এ যে আমার জীবনের বড় পরম সৌভাগ্য। কিন্তু—

বলো থামলে কেন?

বড় ভয় তোমাকে কোন মুহূর্তে দস্যু বনহুর হত্যা করে বসবে কে জানে। কতক্ষণ আমি তোমায় চোখে চোখে রাখবো।

হাসলো বনহুর —নীলা মরণ যখন আসবে তখন কেউ তা রোধ করতে পারবে না। যাক ওসব কথা শোন নীলা আমি ক'দিনের জন্য দেশে যাবো— মানে বাড়িতে। মালিককে বলবে তিনি যেন ছুটি দেন।

তুমি দেশে যাবে মনির।

বিশেষ জরুরি প্রয়োজন, না গেলেই নয়।

সত্যি তুমি গেলে আমার বড্ড খারাপ লাগবে। আবার কবে আসবে তুমি?

অমাবস্যার আগেই চলে আসবো।

ফিরুগাঁও যাবার সময় তুমি থাকবে আমাদের সাথে না হলে আমি যাবো না কিন্তু ফিরুগাঁয়ে।

তুমি না গেলেও তোমার আব্বু তোমাকে ছাড়বে না। তোমাকে নিয়ে যাওয়াই যে তার মূল উদ্দেশ্য।

বনহুরের মনে কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হলো।

নীলা বললো— চুপ করে রইলে কেন?

নিশ্চয়ই আসবো।

সত্যি গিয়ে ভুলে যাবে না তো।

নীলা তোমাকে ভুলতে চাইলেও ভুলবো না তাই আবার আসবো।

বনহুর খান বাহাদুর আমির আলীর কাছে ছুটি নিয়ে চলে গেলেও সে সত্যি সত্যি গেলো না।

বৃদ্ধ ড্রাইভার জিমসীর বেশে সে এ বাড়িতেই রয়ে গেলো। মস্ত দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখ, চোখে চমশা ডিলা পাজামা পাঞ্জাবী পরা। মাথায় পাগড়ী, ডান হাতে বালা, পায়ে নাগড়া জুতা। জিমসী শিখ ড্রাইভার ছিলো।

একদিন জিমসী যখন তার ছোট কুঠুরীটার মধ্যে নিদ্রায় অচেতন ছিলো তখন বনহুর আলগোছে এসে দাঁড়ালো তার বিছানার পাশে।

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ওর নাকের সামনে ধরলো। কয়েক সেকেণ্ড তারপর রুমাল খানা পুনরায় পকেটে রাখলো বনহুর।

এবার সেই ড্রাইভার জিমসীর দেহটা তুলে নিলো হাতের উপর। গেটের বাইরে একটি গাড়ি অপেক্ষা করছিলো বনহুর জিমসীকে এনে গাড়ির পিছন আসনে শুইয়ে দেয় তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলে— রহমান একে শহরের আস্তানায় যত্ন সহকারে রাখবে। তারপর সরে দাঁড়ায় বনহুর!

ড্রাইভার বেশী রহমান বলে—সর্দার আপনার নির্দেশ মতই কাজ করবো।

গাড়ি দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

বনহুর ফিরে আসে জিমসীর কামরায়।

ছোট আয়না খানার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বনহুর নিজের চেহারাটা সম্পূর্ণ পাল্টে নেয়। লম্বা দাড়ি গোঁফ তাও আবার সাদা ধব ধবে। চোখে চশমা, ডান হাতে বালা। মাথায় পাগড়ী, ডিলা পাজামা আর পাঞ্জাবী। চোখের নীচে একটু কালিমা একটা বয়সের ছাপ।

দিব্য আরামে ঘুমায় বনহুর ভোর পর্যন্ত।

সকালে খানসামা হাসান এসে তাকে জাগিয়ে দেয়— এই এবার উঠো। গাড়ি বের করবে কখন আজ যে রংলাল নেই।

হাই তুলে উঠে বসে জিমসী।

কদিন থেকে বনহুর জিমসীকে সর্বক্ষণ লক্ষ্য করে এসেছিলো। কি তার অভ্যাস, কেমন তার কণ্ঠস্বর, কেমন তার চলাফেরা এমন কি জিমসী কি খেতে ভালোবাসে তাও সে ভালভাবে দেখে নিয়েছিলো। কারণ বনহুর বুঝতে পেরেছিলো রংলালের বেশে এ বাড়িতে তার অবস্থান কাল শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনও তার কাজ শেষ হয়নি। আরও বুঝতে পেরেছিলো রংলালকে হত্যার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে একটা দল, তারা অন্য কেউ নয় জঙ্গল বাড়ি ঘাটির মালিক হামবার্টের।

সেদিন নীলা যদি ডাক্তারের চক্রান্ত বুঝতে না পারতো তা হলে ঐদিন ডাক্তার স্মিথ বিষাক্ত ইনজেকশন দ্বারা চির নিদ্রায় অচেতন করে ফেলতো রংলালকে। আর কোনদিন সে চোখ মেলে তাকাতো না। তাই রংলাল ছুটি নিলো শত্রুর চোখ থেকে আত্মগোপন করার জন্য।

এখানে আসার পর বনহুর কান্দাই জঙ্গল আস্তানায় যাবার সুযোগ করে উঠতে পারেনি কিন্তু প্রায়ই সে গভীর রাতে কান্দাই তার শহরের আস্তানায় গিয়েছে। ওয়্যারলেছে রহমানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছে।

তার ছদ্মবেশের সরঞ্জামও বনহুর শহরের আস্তানা থেকেই সংগ্রহ করেছিলো।

বনহুর উঠে বসে চোখ রগড়ে বলে—হাসান ভাই তুমি একটু আরাম করে ঘুমাতে দেবেনা দেখছি।

আরাম, আরাম—আর কত আরাম করবে শিখজ্বি। দেখছোনা কোথাকার আপদ এসে জুড়ে বসেছে। মালিক আর মালিকের মেয়েকে দখল করে নিয়েছে—বেটা যেন রাজ্য জয় করে নিয়েছে একেবারে! আর দুটো দিন থাকলে ওকে শেষ করে দিতাম।

দু'চোখ কাপালে তুলে বলে জিমসী—আর দু'টো দিন থাকলে তাকে শেষ করে দিতে মানে খতম করে দিতে?

হাঁ শিখজী হাঁ।

বলো কি হাসান!

রংলালকে পরপারে পাঠাতে পারলে আমার মোটা বখশীস মিলবে। শোন শিখজী খবরদার এসব কথা কারো কাছে বলবেনা।

দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বলে জিমসী—হাসান ভাই এক সঙ্গে কত দিন ধরে কাজ করছি আজও আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না? তুমি বখশীস পেলে আমাকে কি খাওয়াবে হাসান ভাই বলো না।

তোমাকে খৈনি কিনে দেবো এক কৌটা.....খুব করে ঠোঁটে লাগাবে।

মিষ্টি-উষ্টি খাওয়াবে না হাসান ভাই?

আগে কাজ হাসিল করি.....

কিন্তু তোমার শিকার তো ভেগেছে।

যাবে কোথায়। যে মধুর সন্ধান সে পেয়েছে এতো সহজে সরে পড়বে বলে মনে হয় না। দশ দিনের ছুটি নিয়ে গেছে চারদিন যেতে না যেতেই বেটা এসে পড়বে। তখন ওর একদিন না আমার একদিন দেখে নেবো! মেম সাহেব কিন্তু বড্ড খেয়ালী হয়ে উঠেছে এই যা একটু কষ্ট হবে আমার।

তার মানে?

মানে রংলালকে সব সময় মেম সাহেব আগলে থাকে, যেন কেউ তাকে ছিনিয়ে নেবে তার কাছ থেকে।

তা তো ঠিকই হাসান ভাই তুমি যে ভাবে রংলালকে হত্যা করার ব্রত নিয়েছো তাতে মেম সাহেব খেয়াল না রাখলে কবে রংলাল পাতালপুরিতে গিয়ে হাজির হতো মানে কবরে গিয়ে.....বুঝলে তো?

তা আর বুঝিনি কিন্তু এবার এলে হয়। মেম সাহেবের চোখে কেমন করে ধুলো দিতে হয় জানি। হামবার্ট সাহেব এবার এমন একটা ঔষধ দিয়েছে যা খাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বোবা বনে যাবে। একটি কথা আর সে বলতে পারবে না বা তার কোন স্মৃতি শক্তি থাকবে না।

জিমসীর মুখ খানা হাসিতে ভরে উঠে—বাঃ বাঃ খুব ভাল ঔষধ তো। ঔষধটা তুমি পেয়ে গেছো এতো তাড়াতাড়ি?

হাঁ। জঙ্গল বাড়ি থেকে লোক এসেছিলো এই ঔষধটা নিয়ে কিন্তু তার আগেই রংলাল ছুটি নিয়ে চলে গেছে। না হলে বেটাকে আমি বোবা আর পাগল করে ছাড়তাম না।

যাক এসব কথা যখন তখন যেখানে সেখানে বলা ঠিক নয় হাসান ভাই। তুমি এখন কাজে যাও আমি গাড়ি বের করিগে। মেম সাহেব আবার কোথায় যান কে জানে।

হাসান বলে—আমি কাউকে ভয় করিনা জিমসী। শুধু ভয় পাই মেম সাহেবকে। আজকাল মেম সাহেব আমার দিকে কেমন সন্দেহ নিয়ে তাকায়। আমি রংলালকে কোন খাবার এনে দিলে খেতে দেয় না। মেম সাহেব নিজে হাতে খাবার এনে দেয়.....

তাহলে তো মুস্কিল। রংলালের সংগে যে ভাবে মেম সাহেব লেগে আছে তাতে তোমার কাজ সমাধা হবে বলে মনে হয় না।

আমি এবার চালাক হয়ে গেছি শিখজী।

তাই নাকি?

হাঁ।

একটু বলবে না হাসান ভাই আমাকে?

শিখজী আমি তোমাকে সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। কারণ এ বাড়িতে যত চাকর বাকর আর খানসামা ড্রাইভার এসেছে সবার মধ্যে আমরাই পুরোন। সবাই এসেছে আর গেছে তুমি আর আমি শুধু টিকে আছি। তাই তো আমি তোমার কাছে মনের কথা বলি।

আচ্ছা তা হলে তুমি বলতে পারো হাসান ভাই রংলালকে হত্যা করার নতুন ঔষধটা কি?

হত্যা নয় বোবা আর স্মৃতি বিকৃতি হবে তার।

মানে উন্মাদ হয়ে যাবে এই তো?

হাঁ।

কি ঔষধ আর কি ভাবে তাকে খাওয়াবে?

চমৎকার একটা বুদ্ধি আবিষ্কার করেছি। সাবধান এ কথা ঘুণাক্ষরেও বলবে না কাউকে।

না-না-না এই নাক কান মলে বলছি বলবো না।

বেশ শোন। পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বের করে বলে এই সেই হীরক চূর্ণ.....

হীরক চূর্ণ।

হাঁ হীরক চূর্ণ এর নাম। অতি ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক ঔষধ।

বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে দেখে জিমসী ঔষধের শিশিটা।

হাসান চোখ মুখ বিস্ফারিত করে বলে—এ গুড়ো শুকনো গেলাসে ছড়িয়ে দিয়ে রাখবো। মেম সাহেব যখন নিজের হাতের শূন্য গেলাসে পানি বা দুধ এনে রংলালকে খেতে দেবে তারপর বুঝলে শিখজী? শুকনো গেলাস বা কাপে এই হীরক চূর্ণ দিলে একটুও বোঝা যাবে না।

শিখজী শুধু একটা শব্দ করলো মাত্র।

হাসান বললো—এ ঔষধ আমি কোন সময় কাছ ছাড়া করিনা। রংলালকে বোবা আর উন্মাদ বানাতে পারলে আমি আর খানসামা থাকবো না।

দেখো হাসান ভাই আমাকে ভুলে যেওনা তখন।

না-না ভুলবোনা। যাও তুমি এবার গাড়ি বের করোগে। চলে যায় হাসান মিয়া।

জিমসী এগিয়ে যায় গ্যারেজের দিকে।

গাড়ি বের করে পরিষ্কার করতে থাকে ব্রাস দিয়ে।

বেলা বাড়ছে।

গাড়ি পরিষ্কার হলো।

তবু গাড়ির পাশে কেউ এলোনা। কারো যেন প্রতিক্ষা করে জিমসী। বারবার তাকায় সে বাসার দিকে।

সমস্ত দিন জিমসী কোন কাজ পায় না। কেমন যেন অসহ্য লাগছে আজ ওর। গাড়ি চালানো ছাড়া আর কিই বা কাজ আছে তার। সারাদিন বসে বসে খৈনি ডলা আর ঠোটের নিচে দেওয়া এইতো ওর কাজ।

এক সময় জিমসী নীলার ঘরে গিয়ে হাজির হয়।

নীলা এলোমেলোভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলো।

জিমসীর পদশব্দে ফিরে তাকায়—তুমি।

হাঁ মেম সাহেব।

কিছু বলবে?

আজ বাইরে যাবেন না মেম সাহেব?

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে নীলা—না।

সেকি মেম সাহেব রংলাল নেই বলে আপনি বাইরে যাবেন না?

শরীর ভাল লাগছে না।

বাইরে গেলেই ভাল লাগবে মেম সাহেব।

তুমি যাও জিমসী মন ভাল নেই।

তাই বলুন মেম সাহেব। একটু হেসে বেরিয়ে যায় জিমসী।

নীলা দু'দিন বাইরে বের হয়না, সদা বিষণ্ন মন নিয়ে নিজের ঘরে বসে থাকে চুপচাপ। হয় পড়াশোনা করে নয় রেডিওতে গান শোনে।

নীলার এই বিষন্ন ভাব জিমসীর মনকে ভাবিয়ে তেলে। মাঝে মাঝে এটা ওটা নিয়ে নীলার কক্ষে যায় সে কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সুযোগ সে পায়না।

জিমসী হয়তো সকালে এক থোকা রজনী গন্ধা নিয়ে হাজির—মেম সাহেব ফুল।

নীলা অন্যমনস্কভাবে বলে—রেখে যাও ফুলদানীতে।

জিমসী ফুলদানীতে ফুল রেখে বেরিয়ে যায়।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও জিমসী এক থোকা ফুল নিয়ে নীলার ঘরের দিকে যাচ্ছিলো হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো খানসামা হাসানের গলা, চাপা কণ্ঠে কথা বলছে সে.....মালিক সব ঠিক করে রেখেছি, রংলাল ফিরে এলেই আমি তাকে হীরক চূর্ণ খাওয়াবো.....হাঁ কেউ টের পাবে না.....শিশিটা সব সময় আমার সংগে সংগে রেখেছি——না মেম সাহেব এ ক'দিন বাইরে যায়নি— —আমি খেয়াল রেখেছি তার উপর——মালিক বখশীসটা আমার— —আচ্ছা—আচ্ছা—

হঠাৎ কাধে স্পর্শ অনুভব করে হাসান, চমকে ফিরে তাকায়—আরে জিমসী তুমি। আমি তো ভীষণভাবে ভড়কে গিয়েছিলাম।

আরে না না আমি ছাড়া আর কে তোমার এমন দোস্ত আছে বলো। সত্যি হাসান ভাই তোমার মত ভাল মানুষ হয়না। দেখো ভাই আমি বুড়ো মানুষ

আজ আছি কাল নাই। তুমি তো আমার ছোট ভাই এর মত আমাকে বিশ্বাস করবে কেমন!

তা আর বলতে হবে না। আচ্ছা ভাই ওটা কি? জিমসী হাসানের হাতের মুঠায় ছোট ওয়্যারলেস যন্ত্রটা দেখিয়ে বলে।

ও তুমি বুঝবে না জিমসী।

তবু বলোনা একটু। তুমি কার সংগে কথা বলছিলে?

এটা ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্র। কথা বলছিলাম—আমাদের জঙ্গল বাড়ি ঘাটির মালিকের সঙ্গে।

সত্যি?

হাঁ সত্যি না তো কি।

হাসান ভাই আমার বড্ড জঙ্গল বাড়ি ঘাটিতে যেতে ইচ্ছা করে। নিয়ে যাবে একবার আমাকে?

পাগল আর কি। জঙ্গল বাড়ি যাবে তুমি—বন্ধু হাসালে আমাকে। জঙ্গলবাড়ি ঘাটিতে যে একবার গিয়েছে সে আর কোনদিন ফিরে আসেনি।

দু চোখ কাপালে তুলে বলে জিমসী—তার মানে?

মানে আজও আমি জঙ্গলবাড়ি ঘাটি চোখে দেখিনি। আমাদের দলের লোক কেউ দেখেনি।

তবে কাজ করো কি করে?

আমাদের দলের সবার কাছে এমনি একটি করে ক্ষুদে ওয়্যারলেস আছে যার মধ্যে আমরা কাজের নির্দেশ পাই যে কি ভাবে আমরা কাজ করবো। হাঁ একদিন জঙ্গলবাড়ি ঘাটিতে যাক পড়ে, মৃত্যুদণ্ডাদেশ যেদিন হয়।

সর্বনাশ আমি চাইনা অমন ঘাটি দেখতে.....কাঁপতে শুরু করে জিমসী।

হাসে খানসামা হাসান—এই সাহস নিয়ে চাও জঙ্গল বাড়ি ঘাটি দেখতে!

যা হোক ভাই আমি ও সবের মধ্যে নাই। ড্রাইভারী করি দিব্য আরামে নাক ডেকে ঘুমাই.....বুড়ো হয়েছি কবে মরবো ঠিক নাই। বেরিয়ে যায় জিমসী।

ফুল হাতে নীলার ঘরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠে জিমসী। নীলা বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

জিমসী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ওর চোখ দুটো কেমন ছলছল হয়ে উঠলো। নীলার ব্যাথাটা তার হৃদয় স্পর্শ করলো, পারলোনা সে নিজেকে স্থির রাখতে এগিয়ে এসে নীলার পিঠে হাত রাখলো—মেম সাহেব।

নীলা আরও বেশি করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

জিমসী বললো—কি হয়েছে মেম সাহেব? আজ ক'দিন থেকে আপনাকে বড্ড অসুস্থ মনে হচ্ছে।

তুমি বুঝবে না জিমসী বাবা, তুমি বুঝবে না।

নীলা জিমসী ড্রাইভারকে জিমসী বাবা বলে ডাকতো। কারণ সে তাকে ছোট বেলা থেকে দেখে আসছে। ওর কোলে কাঁধে চেপে কত খেলা করেছে নীলা। জিমসী ওকে অনেক স্নেহ করে।

নীলা সোজা হয়ে বসে আঁচলে চোখ মুছে বলে—জিমসী বাবা তুমি আমাকে কত ভালবাসো। তুমি রংলালকে ভালবাসো?

হাঁ বড় ভাল ছেলে তাই আমিও ভালবাসি। কিন্তু ছেলেটা গেলো আর এলোনা কেনো?

আসবে বলে গেলো, জানিনা আর আসবে কিনা.....বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে ওর গলা!

জিমসী নীলার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলে—মেম সাহেব সে যদি আর না আসে তাতে কি হবে?

তুমি বুঝবেনা জিমসী বাবা।

জানি মেম সাহেব আপনি তাকে ভাল বেসেছেন কিন্তু আপনি ভুল করেছেন। সে কোথাকার কে কি তার পরিচয় কিচ্ছু আপনি জানেন না। তবু এতো বড় ভুল আপনি কেনো করলেন?

জিমসী বাবা!

জানি তাকে ভুলতে আপানার কষ্ট হবে কিন্তু না ভুলে কোন উপায় নাই।

জিমসী ও কথা তুমি বলোনা। আমার মন বলছে সে আসবে এতো বড় মিথ্যা বলে সে যেতে পারে না।

মেম সাহেব এখনও সময় আছে আপনি তাকে.....

নানা ও কথা আর বলোনা জিমসী। বলো না.....

আপনি রাজার মেয়ে আর সে কোথাকার কে।

সে আমাদের চেয়ে অনেক বড় জিমসী বাবা তুমি তাকে জানো না। আমি জানি এ পৃথিবীতে যত পুরুষ আছে তার মধ্যে সে অসাধারণ.....

এমন সময় আলী সাহেব কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করেন—মা নীলা।

নীলা চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়।

জিমসী সরে দাঁড়ায় এক পাশে। এখনও তার হাতের মুঠায় এক থোকা রজনী গন্ধা।

নীলা কোন কথা বলে না।

আমির আলী সাহেব বলেন—নীলা আর ক'দিন মাত্র বাকি আছে। আমরা ফিরুগাঁও যাবো। তুমি তৈরি থেকো মা।

আচ্ছা আব্বু।

বেরিয়ে যান আমির আলী সাহেব।

জিমসী ফুলগুলো ফুলদানীতে রেখে বেরিয়ে যায়।

কিছুটা এগুতেই জিমসীর নজরে পড়ে আমীর আলী এবং আর একজন অপরিচিত ব্যক্তি কি যেন আলাপ করছে।

জিমসী ইচ্ছা করেই সেই পথে এগিয়ে যায়।

তার কানে ভেসে আসে খানবাহাদুর আমির আলীর কণ্ঠ..... নানা আমি পারবোনা নীলাকে এভাবে তার হাতে তুলে দিতে..... আমি নীল পাথর চাই.....

অপর ব্যক্তির কণ্ঠ.....আপনাকে ভেবে দেখার জন্য সময় দিয়েছে .....ভেবে দেখবেন খান বাহাদুর সাহেব.....

.....ভেবে দেখেছি অমাবস্যার পূর্বে আমি নীলাকে নিয়ে যাবো সত্য কিন্তু পারবো না আমি হামবার্টের হাতে তাকে সমর্পণ করতে... যতক্ষণ না আমার নীল পাথর আমি ফিরে.....পেয়েছি.....

.....জানেন তার পরিণতি কি হবে?

.....জানি আমাকে সে হত্যা করবে।

.....কিন্তু সে হত্যা স্বাভাবিক হত্যা নয় খান বাহাদুর।

এবার চিৎকার করে উঠেন খান বাহাদুর সাহেব—না না আমি তাকে ভয় করিনা। আমার কাছ থেকে সে যথা সর্বস্ব নিয়েছে, ঐ মেয়েটি ছিলো আমার নয়নের মনি তাও তাকে দিতে স্বীকার হয়েছি শুধু নীল পাথরের বিনিময়ে। তুমি ফিরে যাও শিবাজী.....

.....হামবার্ট আপনাকে কোটি কোটি টাকা দেয়নি?

.....দিয়েছে কিন্তু তার বদলে সে আমার কাছ থেকে নীল পাথর নিয়েছে। যে পাথর ছিলো আমার জীবন.....পারবোনা আমি নীলাকে ওর হাতে তুলে দিতে যতক্ষণ না নীল পাথর আমাকে সে দেবে.....

.....আচ্ছা এ সংবাদ আমি তাকে জানাবো।

.....যাও। তাই যাও শিবাজী.....

শিবাজী কটমট করে তাকালো একবার আমির আলী সাহেবের মুখের দিকে তারপর দ্রুত চলে গেলো।

জিমসী তাকিয়ে দেখলো ফটকের বাইরে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে। গাড়িখানায় শিবাজী চেপে বসলো সঙ্গে সঙ্গে উলকা বেগে বেরিয়ে গেলো গাড়িটা।

জিমসী ফিরে এলো তার কক্ষে।

নীলা আর নীল পাথর। এ দু'টো নিয়েই খান বাহাদুর আমির আলী আজ বিপদ গ্রস্থ।

হঠাৎ জিমসীর চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ে। নীলা এসে দাঁড়িয়েছে তার দরজায়—জিমসী বাবা!

চট করে উঠে দাঁড়ায় জিমসী—মেম সাহেব বলুন?

চলো বাইরে যাবো।

আপনি এসেছেন কষ্ট করে। আমাকে ডাকলেই হাজির হতাম।

নীলা গাড়ির পাশে এগিয়ে যায়।

জিমসী গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

নীলা গাড়িতে উঠে বসে।

জিমসী ড্রাইভিং আসনে বসে বলে—কোথায় যেতে হবে মেম সাহেব?

চলো, লেকের ধারে চলো।

গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো জিমসী।

গাড়ি বেগে ছুটে চলেছে।

জনমুখর রাজপথ। পথের দু'পাশে সুউচ্চ অট্টালিকা। মাঝে মাঝে আকাশের কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। লাইট পোষ্টগুলোর মাথায় আলোগুলো এখনও জ্বলে উঠেনি।

জিমসী নীরবে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে।

একপাশে চুপ চাপ বসে আছে নীলা। গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে সে।

সন্ধ্যার একটু আগে লেকের ধারে এসে থামলো গাড়ি খানা।

নেমে পড়লো নীলা।

এগিয়ে গেলো সে যেখানে আর একদিন ওরা বসেছিলো পাশাপাশি। নীলা আর রংলাল।

নীলা নির্বাক নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেই জায়গাটার দিকে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো সেদিনের দৃশ্যগুলো। সে আর রংলাল বসে বসে কত কথা বলেছিলো। নৌকায় বসে ওরা দু'জনা কত হাসি আর গানে মেতে উঠেছিলো।

সব আজ নীলার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

জিমসী অদূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে সব কিছু। নীলার গুণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোটা ফোটা অশ্রু।

জিমসী এসে দাঁড়ায় তার পাশে—মেম সাহেব চলুন এবার।

জিমসীর কথায় চমকে উঠে নীলা তাড়াতাড়ি হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে বলে—চলো।

গাড়িতে ফিরে আসে নীলা আর জিমসী।

পথে একটি কথাও হয়না নীলার সংগে জিমসীর।

সেই দিন গভীর রাতে বনহুর তার জিমসী ড্রেস পালটে চলে যায় তার আস্তানায়। তার শরীরে তখন ছিলো দস্যু ড্রেস।

রহমানের সংগে কিছুক্ষণ তার নিভৃতে আলাপ হয়।

কান্দাই আস্তানা নিয়ে কথা হলো। বেশ কিছুদিন সে আস্তানা ছেড়ে চলে এসেছে নানা সংবাদ ছিলো তাই রহমান সর্দারের কাছে পেশ করলো।

আজ রাতে জিমসীকে তার বাসগৃহে রেখে আসার জন্য নির্দেশ দিলো বনহুর।

এখানে জিমসীকে অতি যত্ন সহকারে রাখা হয়েছিলো। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘর। কোমল দুগ্ধ ফেনিল শয্যা। জিমসী যখন ঘুম থেকে উঠে তখন তার সম্মুখে নানাবিধ খাদ্য সম্ভার এসে হাজির হতো। ফলমূল আর সুস্বাদু পানিয়। জিমসী ভেবে পায় না সে ঘুমের ঘোরে কোথায় কোন স্বপ্ন রাজ্যে চলে এসেছে। মাঝে মাঝে জিমসী শরীরে চিমটি কেটে দেখে জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে সে।

রাজা রাজরার মত এতো খানাপিনা সে কোনদিন খায়নি। এমন সুখও সে পায়নি কোনদিন। সব সময় তার আদেশ পালনে দু'জন দাঁড়িয়ে থাকতো দু'পাশে। জিমসীর খৈনি প্রিয় জিনিস তাই ভাল খৈনি সব সময় রাখা হতো তার পাশে।

জিমসীর মত এতো আরামে কেউ বুঝি থাকেনা। ভোরে ঘুম ভাংতেই জিমসী চোখ বন্ধ করেই বললো—আজ পরোটা আর মুরগীর কারাব খাবো!

কিন্তু কই কারো পদশব্দ শোনা গেলোনা।

চোখ খুললো জিমসী, কিন্তু একি এখন সে কোথায়। তার দুগ্ধ ফেনিল বিছানাই বা গেলো কোন খানে। দড়ির শক্ত খাটিয়ায় কম্বলে সে শুয়ে আছে।

চিৎকার করে ডাকলো—এই তোমরা সব গেলে কোথায়? আমার খানা কই.....আমার খানা.....তবু কেউ এলোনা।

আরও চিৎকার শুরু করলো জিমসী।

চাকর বাকর আর খানসামা দারোয়ান সবাই ছুটে এলো ব্যাপার কি।

জিমসী তখনও বলে চলেছে—এই তোমরা হা করে দেখছো কি? আমার খাবার নিয়ে এসো।

সবাই তো অবাক, জিমসী বলে কি।

জিমসী তখনও বলে চলেছে—আমার বিছানা কোথায় গেলো। একি বিশ্রি বিছানা তোমরা আমাকে দিয়েছো? এই এতোক্ষণও আমার খাবার আনছো না কেনো! হা করে কি দেখছো তোমরা.....

জিমসীর কথাবার্তা শুনে সবাইতো অবাক। হেসে উঠলো তারা। বললো, জিমসী পাগল হয়ে গেছে। খবর নিয়ে ছুটলো ওরা খান বাহাদুর আমির আলীর কাছে।

হাসান মিয়াই এসে জানালো প্রথম—মালিক শিখজী পাগল হয়ে গেছে।

জিমসী পাগল হয়ে গেছে।

আমির আলী সাহেব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটে এলেন, সত্যই জিমসী আবোল তাবোল বকছে।

সংবাদটা নীলার কানেও পৌঁছলো।

নীলা তো বিস্মিত হতবাক। কাল সন্ধ্যা বেলাই জিমসী নিজে তাকে ড্রাইভ করে নিয়ে গিয়েছিল লেকের ধারে। একটি রাতের মধ্যেই জিমসী পাগল হয়ে গেলো।

নীলা নিজে গেলো জিমসী বাবাকে দেখতে। একেই তার মনের অবস্থা ভালো ছিলো না তারপর জিমসী বাবার এই অবস্থা।

জিমসীর জন্য ডাক্তার স্মিথ এলেন। ওকে পরীক্ষা করে বললেন—জিমসীর মাথা খারাপ হয়েছে।

সেইভাবে চিকিৎসা শুরু হলো।

এমন সময় রংলাল এসে হাজির।

আমির আলী সাহেব ওকে দেখে খুশি হলেন, তিনি বলেই বসলেন—আজ এসে খুব ভালো করেছো রংলাল। জানো জিমসী পাগল হয়ে গেছে।

অবাক হয়ে বলে রংলাল মালিক সে জন্য আমি দুঃখ পাচ্ছি কারণ জিমসী ছিলো অত্যন্ত ভালো মানুষ।

নীলা দূর থেকে রংলালকে দেখলো। দীপ্ত হয় উঠলো তার নীল চোখ দুটো। ইচ্ছা থাকলেও পারলো না সে ছুটে যেতে। নিজের ঘরে এসে মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে থেকে রংলালকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।

রংলালের আগমনে খান বাহাদুর আমির আলির বাড়ির কারো মনে কোন প্রতিক্রিয়া শুরু না হলেও খানসামা হাসান মিয়ার মনে ভীষণ আলোড়ন শুরু হলো।

হাসান আড়ালে আত্মগোপন করে ওকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো। কোমরে হাত দিয়ে হীরক চূর্ণের শিশিটা দেখে নিলো সে একবার।

রংলাল এসেছে এযে নীলার কাছে কত আনন্দের কথা আর কেউ তা বুঝবে না। নীলা উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতিক্ষা করতে লাগলো সেই মুহূর্তটির যে সময়টিতে তাকে পাশে পাবে সে।

রংলাল তার ঘরে জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখছিলো।

এমন সময় নীলা এসে দাঁড়ায় তার পিছনে—মনির।

ফিরে তাকায় রংলাল—কে আপামনি।

হাসে নীলা।

রংলাল এগিয়ে এসে—নীলা কেমন ছিলে?

মুখমণ্ডল বিষণ্ন করে এরপর বলে নীলা—দশদিনের কথাবলে চলে গেলে এলে তো পনেরো দিন পর।

ভেবেছিলে আর আসবো না!

নীলা মাথা দুলিয়ে বলে—হাঁ।

যদি সত্যি না আসতাম?

নীলাকে কেউ খুঁজে পেতো না। .....

নীলা!

হাঁ মনির!

এ তুমি কি বলছো নীলা? ধীরে ধীরে বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়ে। তামাসার ছলে ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়ে গেছে এই মুহূর্তে তা ভালোভাবে উপলব্ধি করে সে। নীলাকে এখন ফেরাবার উপায় কি—ভাবে বনহুর।

নীলা ওকে গম্ভীর হতে দেখে সরে আসে—কি হলো তোমার মনির!

বনহুর কোন কথা বলেনা, মুক্ত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তাকায় সে সীমাহীন আকাশের দিকে। আজ নতুন করে নীলার আর একটা দিক তাকে অস্থির করে তোলে। বারবার নীলার একটি কথা কানের কাছে প্রতিধ্বনি জাগায়—যদি সত্যি না আসতাম.....নীলাকে কেউ খুঁজে পেতো না...নীলাকে কেউ খুঁজে পেতো না...

নীলা এগিয়ে এসে বনহুরের পিঠে মাথা রেখে বলে—কি হলো কথা বলছো না কেনো? সত্যি কথা বলবে না।

বনহুর বলে—নীলা তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

বেশ বলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে হাসান, ট্রে'র উপরে কয়েকটা বিস্কুট এবং চায়ের সরঞ্জাম।

রেখে বেরিয়ে যায় হাসান।

নীলা বলে—আমি তোমায় চা বানিয়ে দিচ্ছি।

বনহুর কোন কথা বলে না।

নীলা চা তৈরি করে বাড়িয়ে ধরে—নাও।

বনহুর চায়ের কাপ হাতে নেয় কিন্তু চায়ের কাপে সে চুমুক দেয় না। উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এসো নীলা। দুটো বিস্কুটও সে তুলে নেয় হাতে।

নীলা বিস্ময় নিয়ে তাকায়।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়ে বলে—আমার সঙ্গে এসো।

নীলা বনহুরকে অনুসরণ করে।

বনহুর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। নীলা তার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

অদূরে একটি কুকুর দাঁড়িয়েছিলো বনহুর তার হাতের বিস্কুট আর চা ঢেলে দেয় কুকুরটার সামনে!

কুকুরটা খেতে শুরু করলো।

বনহুর আর নীলা দাঁড়িয়ে আছে স্থির ভাবে।

কুকুরটা বিস্কুট এবং চা টুকু খাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো তারপর পড়ে গেলো মাটিতে। মাথাটা বার দুই আছাড় দিয়ে নীরব হয়ে গেলো।

নীলার দু'চোখ কপালে উঠেছে। সে হতবাক হয়ে তাকায় রংলালের মুখে তারপর দু'হাতে ওর জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে উঠে—কি সর্বনাশ। হাসান বিষ মিশিয়ে এনেছিলো আমি জানতাম না মনির!

ফিরে এলো বনহুর আর নীলা ঘরে।

নীলার দু'চোখে রাগ ঝরে পড়ছে। সে বললো আমি এই মুহূর্তে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবো। আব্বুকে সব কথা বলবো আমি।

না না আব্বুকে কিছু বলতে যেওনা নীলা আর হাসানকে তাড়িয়ে দিলেও সে আমার পিছু ছাড়বে না। আমাকে হত্যা না করা পর্যন্ত ওর স্বস্তি নাই।

মনির!

হাঁ নীলা, সেই কারণে আমি এখানে না থাকাই শ্রেয় বলে মনে করি তাছাড়া তোমারও বিপদ আসতে পারে।

আমার জন্য একটুও ভাবি না মনির যত ভাবনা তোমাকে নিয়ে। বলো কি বলবে বলেছিলে।

আজ নয়, বলবো যেদিন বলার সময় আসবে।

নীলা বলে—আমি সেদিনের জন্য অপেক্ষা করবো।

❑

একদিন খানসামা হাসান উধাও।

আমির আলী সাহেব ওর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শুধু তিনি নন, বাড়ির সবাই এমন কি নীলাও বিস্মিত অবাক লোকটা গেলো কোথায়।

বনহুর নিজেও আশ্চর্য হলো এভাবে সে উঠে যাবে ভাবতে পারেনি।

এখানে যখন হাসানকে নিয়ে খোঁজা খুঁজি চলেছে তখন জঙ্গল বাড়ির ঘাটিতে হাসানকে পিছ মোড়া করে বাঁধা অবস্থায় গরম লৌহ শলাকা দিয়ে শেক দেওয়া হচ্ছে।

সম্মুখে দন্ডায়মান চন্ডাল হামবার্ট চাটার্যি। দু'চোখ তার অগ্নিবর্ণ। দাঁত মুখ খিঁচে বলে উঠে, একটা সামান্য কাজ তোমার দ্বারা সমাধা হলো না। অপদার্থ কোথাকার। হীরক চূর্ণ দিয়েও তুমি ওকে হত্যা করতে সক্ষম হলে না।

সমস্ত দেহ ক্ষত বিক্ষত, হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠে হাসান—আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি মালিক কিন্তু...

তোর জিভ ছিড়ে ফেলবো—গর্জে উঠে হামবার্ট।

সঙ্গে সঙ্গে একটি লৌহ শলাকা তুলে নেয় সম্মুখের অগ্নিকুন্ড থেকে।

হাসানের চোখ দু'টো গোলাকার হয়ে উঠে। চিৎকার করে উঠে—মালিক—মালিক.....

কিন্তু কে শুনবে তার করুণ চিৎকার। হামবার্টের হাতের অগ্নি দগ্ধ শালাকা এসে বিদ্ধ হয় হাসানের বুকে।

সাঁ—সাঁ করে একটা শব্দ হয় সঙ্গে সঙ্গে একটা ধুম্রশিখা বেরিয়ে আসে লৌহ শলাকার মুখ থেকে। তার সঙ্গে হাসানের মৃত্যু ভয়ঙ্কর আর্তনাদ।

হামবার্ট এবার অগ্নি দগ্ধ শলাকাটা এক টানে বের করে নেয় অমনি হাসানের মাথাটা ঝুলে পড়ে এক পাশে। একটা থামের সঙ্গে তার দেহটা বাধা থাকায় হাসান পড়ে গেলো না।

হামবার্ট মুখে একটা শব্দ করলো অমনি দু'জন বলিষ্ঠ লোক হাসানের প্রাণহীন দেহটা নামিয়ে নিলো থাম থেকে।

পরদিন।

সকালে আমির আলী সাহেব সবেমাত্র তাঁর হলঘরের বারেন্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় তার পুরোন চাকর একটা ঝুড়ি এনে রাখলো আমির আলী সাহেবের সম্মুখে—মালিক এ ঝুড়িটা একটি লোক দিয়ে গেলো। এর মধ্যে নাকি ফল আছে।

আমির আলী সাহেব খুশি হয়ে বললেন—যাও নাস্তার টেবিলে রাখোগে।

চাকরটি ঝুড়ি নিয়ে ভিতর বাড়িতে চলে গেলো।

বাবুর্চি সকালের নাস্তা টেবিলে সাজিয়ে প্রতিদিনের মত ডাকলো—মালিক টেবিলে নাস্তা দেওয়া হয়েছে।

আমির আলী সাহেব নীলাসহ টেবিলে এসে বসলো।

আজ রংলাল আছে পরিবেশনায়।

পিতার সম্মুখে নীলাও ওকে নাস্তার টেবিলে বসার জন্য অনুরোধ করতে সাহসী হয় না। অবশ্য নীলা এজন্য মনে মনে লজ্জিত দুঃখিত ব্যথিত! সে অন্য সময় এগিয়ে বলে—মনির তোমাকে আজও সব কাজ করতে হবে সে জন্য আমি অনুতপ্ত।

হেসে বলে রংলাল, আমি কিন্তু মোটেই এ জন্য দুঃখিত নই নীলা। এছাড়া আমি করবোই বা কি তোমাদের এখানে। খাবার সময় পরিবেশনা আর বাইরে যাবার সময় গাড়ি চালনা এই তো আমার কাজ। মালিক মাসে দু'শো টাকা দেন.....

নীলা হেসে ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিলো ওসব বলে আমাকে লজ্জা দিওনা মনির। তুমি হাজার হাজার টাকা বিলিয়ে দাও গরিব দুঃখিদের মধ্যে আর তুমি আব্বুর কাছে দু'শো টাকা মাইনের চাকরি করো.....

নীলার কথায় ও হেসেছিলো শুধু, কোন জবাব দেয়নি।

রংলাল নাস্তার প্লেটগুলি এগিয়ে দিচ্ছে অপর একজন বয় ঝুড়ি খুলে সবে মাত্র ফল মূল বের করতে যায়। ডাক্না খুলতেই চিৎকার করে উঠে বয়—উঃ.....সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে সে ভূতলে।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা বিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল।

রংলাল বেশী বনহুর তাকায় বয়টার মুখে।

বয় বলে উঠে—মালিক ঝুড়ির মধ্যে দেখুন। ঝুড়ির মধ্যে....

আমির আলী সাহেব তাড়াতাড়ি এগিয়ে ঝুকে পড়লেন এবং অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—ছিন্ন মস্তক...

নীলা পিতার সঙ্গে তাকিয়েছিলো ঝুড়িটার মধ্যে সে একটা তীব্র আর্তনাদ করে টলে পড়ে যাচ্ছিলো।

কিন্তু রংলাল তাকে ধরে ফেললো।

নীলার সংজ্ঞাহীন দেহটা রংলাল হাতের উপর তুলে নিয়ে একটা সোফায় শুইয়ে দিলো।

ফিরে এলো সে ঝুড়িটার পাশে।

ভাল করে লক্ষ্য করতেই রংলাল বেশী বনহুরের চোখ দু'টো বিস্ময়ে ভরে উঠলো কিন্তু সে একেবারে হতবাক হলোনা কারণ সে জানতো হাসানের এমনি একটা পরিণতি হবে। ঝুড়ি থেকে একটা দ্বিখণ্ডিত মস্তক সে তুলে রাখলো টেবিলে।

সবাই তাকিয়ে দেখলো খানসামা হাসানের মাথা।

একটি চিঠি ঝুলছে মাথাটার সংগে।

আমির আলী সাহেব চিঠিখানা কম্পিত হাতে তুলে নিলো। মেলে ধরলো চোখের সামনে. চিঠিতে লিখা আছে মাত্র কয়েকটি শব্দ—

খান বাহাদুর, আমার আদেশ যদি
অমান্য করো তাহলে তোমার
অবস্থা হাসানের মতো হবে। হামবার্ট—
আমির আলী সাহেব মূর্ছা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো তাড়াতাড়ি তাকে ধরে বসিয়ে দিলো রংলাল!
ততক্ষণে লোকজন সবাই এসে জোড়া হয়েছে।
কেউ কেউ পুলিশে সংবাদ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো।
আমির আলী সাহেব বলে উঠলেন—না, পুলিশ জানানোর কোন দরকার নেই।
মালিকের কথা কেউ অমান্য করতে পারেনা সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে ক্ষান্ত হয়ে যায়।
রংলাল সেই ফাঁকে বেরিয়ে যায়।
নীলার তখনও সংজ্ঞা ফিরে আসেনি, রংলাল এসে গেলাসে খানিকটা পানি নিয়ে ছড়িয়ে দিলো ওর চোখে মুখে।
একটু পরে জ্ঞান ফিরে এলো নীলার। চোখ মেলে সে তাকিয়ে বললো—একি দেখলাম.....একি দেখলাম আমি.....
বনহুর ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললো—ও কিছু না নীলা।
ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো নীলা—আমি যা দেখলাম তা সত্য নয়? সেই ছিন্ন রক্তাক্ত মস্তক।
স্থির হয়ে সব শোন নীলা। যে ছিন্ন মস্তক তুমি দেখেছো তা খানসামা হাসানের।
খানসামা হাসানের মাথা ওটা?
হাঁ।
নীলা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে।
বনহুর বলে—নীলা তোমার আব্বুর ও এই অবস্থা হবে।
মনির। আর্তনাদ করে উঠে নীলা।
হাঁ কারণ তুমি পরে সব জানতে পারবে নীলা।
এ তুমি কি বলছো?
সত্যি কথা নীলা তোমার আব্বু যে চক্রান্তের সংগে জড়িয়ে পড়েছেন তা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারবেন না।
আমি কিছু বুঝতে পারছিনা মনির।
এখন তুমি অভিশপ্ত অবস্থায় রয়েছো কাজেই কিছু বুঝতে পারবে না।
সমস্ত দিন নীলা আর খেলোনা বা সে বাইরে বের হলোনা। সব সময় নিজের বিছানায় শুয়ে রইলো।

খান বাহাদুর সাহেবও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন। তার ল্যাবরেটরিতে তিনি সেই যে ঢুকলেন আর বের হবার কথা নাই।

বনহুর সব লক্ষ্য করছিলো!

খান বাহাদুর সাহেব যখন তার গবেষণাগারে প্রবেশ করলেন তখন বনহুর দূর থেকে সব খেয়াল করলো, সেও রংলালের বেশে খান বাহাদুরকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে গেলো।

গবেষণাগারে প্রবেশ করে দেখলো বনহুর খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব গবেষণাগারে নেই। তিনি কোথায় উধাও হলেন ভেবে পেলোনা রংলাল বেশী বনহুর।

সে যখন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে তখন হঠাৎ সেই অদ্ভুত লাল আলোটা জ্বলে উঠলো।

বনহুর তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গিয়ে ওপাশের সুইচটা টিপে ধরলো। সংগে সংগে একটা গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। এ সেই কণ্ঠ..... খান বাহাদুর তোমার উপঢৌকন পেয়েছো.....হুঁসিয়ার আগামী অমাবস্যার কথা ভুলে যেওনা যেন.....

বনহুর নিজের গলার স্বরকে যত দূর সম্ভব খান বাহাদুর আমির আলীর মত করে বললো.....আপনার আদেশ আমার স্মরণ আছে.... আগামী অমাবস্যার জন্য আমিও প্রস্তুত আছি.....

.....প্রস্তুত.....

.....হাঁ প্রস্তুতই বটে কারণ আপনিও আমার জন্য অপেক্ষা করবেন.....

লাল আলোটা দপ করে নিভে গেলো।

বনহুর সুইচ ছেড়ে দিয়ে সরে এলো গবেষণাগারের মেঝেতে চারিদিকে নানা রকম যন্ত্রপাতি সাজানো। টেবিলে ছোট বড় নানা বর্ণের শিশি এবং কাঁচ পাত্র।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে সব লক্ষ্য করছিলো।

হঠাৎ পিছনে এসে দাঁড়ালো খান বাহাদুর সাহেব—রংলাল তুমি।

মালিক আপনার খোজে এসেছিলাম।

তোমাকে একবার বলেছি আমার গবেষণাগারে ঢুকবে না।

মালিক আমার মনে ছিলো না। এই শপথ করছি আর আসবো না।

হাঁ যাও।

আপনি যাবেন না মালিক? সমস্ত দিন নীলা আপামনি কিছু মুখে দেননি.....

সেকি নীলা কিছু খায়নি?

না মালিক।

আচ্ছা চলো দেখছি।

বেরিয়ে এলেন খান বাহাদুর সাহেব।

রংলাল তাকে অনুসরণ করলো।

নীলার কক্ষে ঢুকে বললেন আমির আলী সাহেব—মা নীলা তুমি নাকি সমস্ত দিন কিছু খাওনি?

নীলা নীরব।

তিনি পুনরায় বলেন—কি হলো তোমার নীলা? যা দেখেছো সকালে যা দেখেছো। তা কিছু নয়! কেউ হাসানকে হত্যা করে ওর মাথাটা কেটে আমাকে দেখাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি কিছু ভেবোনা বা এসব নিয়ে চিন্তা করো না।

নীলা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো তার আব্বুর মুখের দিকে।

আমির আলী সাহেব বয়কে নির্দেশ দিলেন—নীলার জন্য খাবার এখানে নিয়ে এসো।

খাবার এলো। কিন্তু নীলা নীরব।

রংলাল এসে দাঁড়ালো—আপামনি খেয়ে নিন।

না আমি খেতে পারবো না।

সেকি না খেয়ে মারা পড়বেন যে আপামনি।

আমির আলী সাহেবও ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—নীলা খেয়ে নাও মা না হলে আমিও খাবো না, খাও বলছি...

তুমি খাও আব্বু আমি খাবো।

সত্যি খাবে তো মা!

হাঁ খাবো আব্বু।

বেরিয়ে যান আমির আলী সাহেব।

নীলা বলে—আমি খেতে পারছি না মনির।

কেনো কি হয়েছে তোমার?

সত্যি হাসানের মতই যদি আব্বুর অবস্থা হয়! তিনি আমার আপন পিতা না হলেও আমি তাকেই যে আপনজন বলে জানি মনির তুমি জানো না আব্বু ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।

জানি নীলা। আমি সব জানি.....আমি কথা দিচ্ছি তোমার আব্বুর জীবনের দায়িত্বভার আমি নিলাম। এবার খাবে তো।

খাবো। নীলা খাবারের থালাটা টেনে নেয় কাছে।

সেদিনই জ্ঞান ফেরার পর নীলার কানে এসেছিলো ছিন্ন মস্তকটার সঙ্গে যে চিঠিখানা ছিলো তার কথা। বয় সবটাই বলেছিলো তার কাছে। চিঠির লেখাগুলো নীলাকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছিলো।

সেইদিন অনেক রাতে খান বাহাদুরের ঘরের পার্শে এসে দাঁড়ালো বনহুর। অন্ধকারে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে রইলো সে। মাত্র কয়েক মিনিট কেটে গেলো দরজা খুলে অতিসন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো আমির আলী।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলেন তারপর গবেষণাগারের দিকে এগুলেন তিনি।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।

গবেষণাগারে প্রবেশ করে এক পাশে একটা মেশিনের সুইচ টিপে দিলো সঙ্গে সঙ্গে মেঝের এক স্থানে একটি সুড়ঙ্গ পথের সিড়ির মুখ দেখা গেলো।

আমির আলী সাহেব সেই সুড়ঙ্গ পথে নেমে গেলেন নিচে!

সংগে সংগে বনহুর এসে দাঁড়ালো সেই জায়গায়।

কয়েক মিনিট দেরী করলো সে।

সুড়ঙ্গ মধ্য হতে কেমন একট শব্দ বেরিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গ মুখ বন্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সমস্ত শরীরে জমকালো ড্রেস। মাথায় পাগড়ী দিয়ে মুখের অর্ধেকটা ঢাকা।

কয়েক মিনিট কেটে গেলো।

বনহুর পূর্বের সেই মেশিনটার পাশের সুইচে চাপ দিলো। সংগে সংগে মেঝেতে সুড়ঙ্গ মুখ বেরিয়ে এলো।

বনহুর কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভারটা খুলে নিলো হাতের মুঠায়।

নিচের দিকে নেমে চলছে বনহুর।

দক্ষিণ হাতে তার রিভলভার।

চারিদিকে ঝাপসা অন্ধকার। একটা শব্দ ভেসে আসছে সুড়ঙ্গ অভ্যন্তর থেকে।

এগিয়ে চললো বনহুর চারদিকে লক্ষ্য রেখে।

বেশ কিছুটা এগুতেই হঠাৎ নজরে পড়লো সুড়ঙ্গ মধ্যে কিছু দূরে কতকগুলো লোক একটি মেশিন দ্বারা আরও একটি সুড়ংগ পথ তৈরি করে চলেছে।

মেশিনটা দেখা মাত্র বনহুর চিনতে পারলো এটা সুড়ঙ্গ তৈরির যন্ত্র মেশিন। এ মেশিন তার নিজেরও আছে। ঘন্টায় অর্দ্ধ মাইল সুড়ংগ তৈরি হয় এ মেশিনে।

বনহুর লক্ষ্য করলো সুড়ঙ্গ পথটা এগিয়ে চলেছে কান্দাই জেল অভিমুখে।

একটি গাড়ি অবিরত মাটি বহন করে বেরিয়ে যাচ্ছে সুড়ঙ্গ পথের অপর দিকে। অদ্ভুত ধরণের পোশাক পরা লোক এই গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে সব লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো। কোন উপায়ে সে নিজকে আত্মগোপন করে সব দেখতে লাগলো।

আরও কিছুটা এগুতেই দেখলো বনহুর একটা নীলাভ আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে। ওদিকে আরও একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে। বুঝতে পারলো সে। ওখানে কি আছে দেখবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠে বনহুর। এবার বনহুর উঁবু হয়ে এগুতে লাগলো।

হঠাৎ গাড়িটা এসে পড়ায় বনহুর সুড়ঙ্গ পথের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

গাড়িটা চলে গেলো পাশ কেটে।

বনহুর এগুলো দ্রুত সেই দিকে যেদিক থেকে নীলাভ আলোক রশ্মি দেখা যাচ্ছিলো।

অল্প এগুতেই দেখলো একটা গবাক্ষ পথে সেই নীলাভ আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসেছে। বনহুর সেই গবাক্ষের পাশে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি তার চলে গেলো ভিতরে। একটি কক্ষ, কক্ষ মধ্যে তীব্র নীলাভ আলো জলছে। সেই আলোকরশ্মিতে বনহুর দেখতে পেলো কক্ষমধ্যে কয়েকজন মুখোস পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে, সবার হাতে এক একটা রিভলভার।

ভালভাবে তাকিয়েই বিস্মিত হলো মুখোস পরা লোকগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব। তার মুখমন্ডলে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে।

রিভলভার ধারীদের একজন বললো—আপনি নীল পাথর খানার বিনিময়ে পেয়েছেন কোটি কোটি টাকা। আরও পেয়েছেন হামবার্টের অসীম সহানুভূতি।

লোকটার কথা শেষ হয় না অপর একজন বলে উঠে—নীলাকে যদি আপনি হামবার্টের হাতে সঁপে না দেন তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনার অবস্থাটা....

এবার খান বাহাদুর বলে উঠলেন—যত ভয় দেখাও না কেনো তোমরা, আমি নীলাকে দিতে পারবো না।

এই কি তোমার শেষ কথা।

হাঁ।

অমাবস্যা রাতে আপনি যাবেন না জঙ্গল বাড়ির ঘাটিতে?

যাবো।

বেশ সেদিনের জন্য মালিক অপেক্ষা করবেন। সেদিন আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করবেন।

অপর আর একজন বলেন আজও আপনাকে ভাববার জন্য সময় দেওয়া হলো।

খান বাহাদুর কোন কথা বললেন না।

কিন্তু তাকে দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন লাগছে।

এবার লোকগুলো কক্ষ মধ্যের এক পাশে সরে এলো। দেওয়ালের একটা সুইচে হাত দিতেই দেয়ালটা ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে পড়লো। মুখোসধারী লোকগুলো সেই পথে অদৃশ্য হলো।

আমির আলী সাহেব থ'হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বনহুর আলগোছে সেই সময় কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে আমির আলী সাহেবের কাঁধে হাত রাখে।

চমকে উঠেন আমির আলী সাহেব, ফিরে তাকাতেই আরষ্ট হয়ে যান, তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন—তুমি।

হাঁ, দস্যু বনহুর!

তুমি এখানে এলে কি করে?

যাদু মন্ত্রের দ্বারা....

কি চাও বলো।

আজ আপনার কাছে এসেছিলাম আপনার দেহ রক্ষী হিসাবে।

দেহ রক্ষী, আমার।

হাঁ।

তুমি-তুমি...

হাঁ আমি আপনার মঙ্গল চাই। আর সেই কারণেই আমি সদা সর্বদা আপনার পাশে পাশে রয়েছি। যদিও আপনি দেশের কলঙ্ক বা অভিশাপ তবু এতো সহজে আপনাকে মরতে দিতে পারি না কারণ এখনও আপনার অনেক কাজ বাকি আছে।

এতোগুলো কথা এক সঙ্গে বললো বনহুর তারপর যেভাবে এসেছিলো সেইভাবে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

আমির আলী সাহেব থ'মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি কিছু বুঝতে পারলেন না।

যখন ফিরে এলেন তিনি তার গবেষণাগারের মধ্যে তখন তার সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। ফ্যাকাশে বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাঁকে।

সিড়ির ধাপ বেয়ে উঠে আসছেন আমির আলী এমন সময় এগিয়ে এসে সংলাপ—মালিক-আপনি।

রংলালকে দেখে প্রথমে চমকে উঠলেন আমির আলী সাহেব তারপর আমতা আমতা করে বললেন—একটু নিচে গিয়েছিলাম। .....আমার শরীরটা কেমন অসুস্থ লাগছে কিনা...

রংলাল বললো—মালিক ধরবো আপনাকে?

হাঁ, ধরে আমার ঘরে একটু পৌঁছে দাও।

রংলাল তাঁকে ধরে ফেললো তারপর নিয়ে এলো ঘরে। যত্ন সহকারে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চাদরখানা টেনে দিলো আমির আলী সাহেবের গায়ে।

পুলিশ অফিসে বসে মনোযোগ সহকারে কাজ করছিলো মিঃ ইলিয়াস। তার সহকারীগণ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত।

হঠাৎ টেবিলে ফোন বেজে উঠলো।

রিসিভারটা মিঃ ইলিয়াস তুলে নিলেন হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ও পাশ থেকে ভেসে এলো একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর.....হ্যালো মিঃ ইলিয়াস সাবধান অচিরেই জেল থেকে ডাঃ রায় উধাও হবেন কাজেই তাকে জেল থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে রাখুন.....

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ ইলিয়াসের মুখমণ্ডলে বিস্ময় ফুটে উঠলো, তিনি বললেন.....কে কে বলছেন আপনি.....হ্যালো কে আপনি—

শোনা গেলো পুনঃ সেই কণ্ঠ.....আমি আপনাদের হিতাকাক্ষী .....বন্ধুজন.....আর একটি দিন ডাঃ রায়কে কান্দাই জেলে রাখা সমীচীন মনে করিনা.....ধন্যবাদ.....

রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

ইলিয়াস সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকেন কিছুক্ষণ থ'মেরে।

তাঁর সহকারীগণ অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন মিঃ ইলিয়াস সাহেবের দিকে।

মিঃ ইলিয়াস সাহেব বললেন—আশ্চর্য ডাঃ রায় জেল থেকে উধাও হবেন বলে কেউ আমার কাছে ফোন করলো, কিন্তু কে তিনি তা কিছুই জানালেন না।

এমন সময় মিঃ হারুন সেখানে হাজির হলো। মিঃ ইলিয়াসের করমর্দন করে বললেন—ইন্সপেক্টার একটি সংবাদ জানাতে ছুটে এলাম।

সংবাদ? কি সংবাদ মিঃ হারুন?

ঘন্টা খানেক পূর্বে কে বা কারা মিঃ জাফরীর কাছে ফোন করে জানিয়েছে ডাঃ রায়কে আজ সন্ধ্যার পূর্বেই কান্দাই জেল থেকে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যেতে।

মিঃ ইলিয়াস বললেন—এই মুহূর্তে আমার কাছেও কে যেন ফোনে ঐ কথা বলছে জানিনা কে সে। তবে আমি জিজ্ঞাসা করায় ফোনে বললো, আমি আপনাদের হিতাকাঙ্খী বন্ধুজন। জানিনা কি তার উদ্দেশ্য..—একটু থেমে বললেন...চলুন মিঃ হারুন মিঃ জাফরীর ওখানে যাওয়া থাক। সেখানে গিয়ে সব বিষয় আলাপ আলোচনা করা যাবে।

হাঁ তাই চলুন ইন্সপেক্টার সাহেব। বললো মিঃ হারুন।

উভয়ে তখনই উঠে পড়লেন মিঃ জাফরীর অফিসের উদ্দেশ্যে।

অল্পক্ষণেই পৌছে গেলেন মিঃ ইলিয়াস এবং মিঃ হারুন মিঃ জাফরীর অফিসে।

মিঃ জাফরী পায়চারী করছিলেন পুলিশ অফিসারদ্বয়কে দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন মিঃ জাফরী—বসুন।

মিঃ ইলিয়াস এবং মিঃ হারুন আসন গ্রহণ করলেন।

মিঃ জাফরীর ললাটে চিন্তা রেখা ফুটে উঠেছে। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আপনারা সবই শুনেছেন বলুন এখন কি করা কর্তব্য? কে সেই ব্যক্তি যে আমাদের সজাগ করে দিয়েছে।

মিঃ হারুন বলে উঠে—এ ব্যাপার সত্য না মিথ্যা তা কি করে বুঝবেন স্যার? তা ছাড়া জেলে এতো কড়া পাহারা ব্যবস্থা সত্ত্বেও ডাঃ রায় কি করেই বা উধাও হবেন?

আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে ব্যাপারটা, অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ তাতে কোন ভুল নাই। বলে থামলো মিঃ ইলিয়াস।

মিঃ জাফরী বললেন—নিশ্চয়ই ব্যাপারটা রহস্যময়। যে ফোন আমি ঘন্টা কয়েক পূর্বে পেয়েছি এবং মিঃ ইলিয়াস আপনিও পেয়েছেন তা দস্যু বনহুর ছাড়া অন্য কারো নয়।

দস্যু বনহুর? অস্ফুট কণ্ঠে বললেন মিঃ ইলিয়াস।

মিঃ হারুন বললো—হাঁ স্যার আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে।

মিঃ জাফরী বলেন—দস্যু বনহুরের সহায়তা ছাড়া ডাঃ রায়কে গ্রেপ্তার করা সম্ভব ছিলোনা কারণ ডাঃ রায় আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সচ্ছন্দে তার হত্যালীলা চালিয়ে চলেছিলেন।

হাঁ স্যার ডাঃ রায় এমন নিখুঁত অভিনয় করেছিলেন যার দরুন তাকে খুনি বলে প্রমাণ করা মুস্কিল ছিলো। দস্যু বনহুর কৌশলে তাকে আবিষ্কার করেছিলো। কথাগুলো বললো মিঃ হারুন।

মিঃ ইলিয়াস বললেন—দস্যু বনহুর এখনও ডাঃ রায় এর সম্বন্ধে সব সংবাদ রেখে চলেছে, আশ্চর্য।

মিঃ জাফরী বললেন—আরও বেশি আশ্চর্য ডাঃ রায় জেল থেকে উধাও হবে এ কথা সে জানলো কি করে। নিশ্চয়ই কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটতে চলেছে যা এখনও পুলিশ মহল জানতে পারেনি।

হাঁ স্যার আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে। না হলে দস্যু বনহুর কিছুতেই এভাবে ফোন করতো না। বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী একটু চিন্তা করে বলে উঠলেন—ডাঃ রায়কে কান্দাই জেল থেকে অন্যস্থানে যেন না নেওয়া হয় এ জন্য কয়েকদিন পূর্বে আমার কাছে খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব এসেছিলেন।

স্যার ডাঃ রায় এর সঙ্গে আমির আলী সাহেবের কি কোন সম্পর্ক ছিলো? বললেন মিঃ ইলিয়াস।

সম্পর্ক বলতে ডাঃ রায় এবং খান বাহাদুর আমির আলী দু'জনা ছোট বেলার বন্ধুলোক এই জানি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সম্পর্কটা শুধু বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ নয় ভিতরে কোন গভীর রহস্যপূর্ণ সম্বন্ধ রয়েছে। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে থাকলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হারুন বললো—স্যার ডাঃ রায়কে আজই হাঙ্গেরী কারাগারে সরিয়ে ফেলা ভাল বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ ইন্সপেক্টার সেই কথা আমিও মনে করছি। নিশ্চয়ই কোন জটিল রহস্য ঘণিভূত হয়ে আসছে। আজই ডাঃ রায়কে কান্দাই জেল থেকে হাঙ্গেরী কারাগারে সরিয়ে ফেলা হোক। মিঃ জাফরী কথাগুলো বলে একটা সিগারেট অগ্নিসংযোগ করলেন।

ঐ দিনই বৈকালে কান্দাই জেল থেকে ডাঃ রায়কে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো।

ডাঃ রায় নিজেও এ ব্যাপারে একেবারে ভেংগে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন মিঃ জাফরী খান বাহাদুর আমির আলীর অনুরোধে তাকে কান্দাই জেল থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলবে না। কিন্তু সব আশা আকাংখা তার বিনষ্ট হয়ে গেলো।

মুষড়ে পড়লেন ডাঃ রায়।

এ সংবাদ জংগল বাড়ি হামবার্টের কানেও গিয়ে পৌঁছলো।

হামবার্টের দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হলো। সে ফেটে পড়লো বোমার মত, তার অনুচরদের আদেশ দিলো সুড়ঙ্গ খনন কাজ বন্ধ করে দাও।

তৎক্ষণাৎ সুড়ঙ্গ খননের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

আমির আলী সাহেব যখন সব শুনলেন তখন তার হৃদকম্প শুরু হলো কারণ তিনি জানেন শয়তান হামবার্ট কত বড় দুর্দান্ত নর পিশাচ।

আমির আলী সাহেব উদভ্রান্তের মত হয়ে উঠলেন। হঠাৎ তার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিলো।

রংলাল সব লক্ষ্য করছিলো।

সে নিজে এর মূল, ডাঃ রায়কে হাংগেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়ার পিছনে তার অদৃশ্য হস্ত কাজ করে চলেছে। মৃদু হাসলো রংলাল আড়ালে দাঁড়িয়ে।

❑

কাল অমাবস্যা।

আজ সমস্ত দিন খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব তার গবেষণাগারে বসে কাজ করে চলেছে। কি করছেন তিনিই জানেন।

রংলাল একবার এসে জানালো—মালিক কাল অমাবস্যা ফিরুগাঁও যাবার জন্য আয়োজন করবো কি?

ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন আমির আলী সাহেব—নিশ্চয়ই করবে। মা নীলাকেও বলে দাও রংলাল সে যেন তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গুছিয়ে নেয়।

রংলাল ফিরে আসে।

নীলার কক্ষে প্রবেশ করে বলে রংলাল—নীলা কাল অমাবস্যা ফিরুগাঁও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও।

নীলার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠে খুশি ভরা গলায় বলে—মনির এই দিনটির জন্য আমি প্রতিক্ষা করছিলাম।

নীলা তখনই তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দিল।

রংলাল তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

ভাবছে রংলাল, নীলা যদি জানতো তার জন্য ফিরুগাঁও এক অভিশপ্ত পুরি তাহলে সে কোন ক্রমেই সেখানে যেতে চাইতোনা। নীলা গুন গুন করে গান গাইছিলো আর সব গুছিয়ে নিচ্ছিলো। রংলাল দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো তার দিকে।

নীলা বললো—মনির তুমি থাকবে পাশে সত্যি এটা আমার কম আনন্দ নয়। কতবার ফিরুগাঁও গেছি কিন্তু.....

বলো থামলে কেনো?

একটু আনন্দ পাইনি, কেমন যেন নীরস মনে হতো সবকিছু।

এবার বুঝি খুব আনন্দ হচ্ছে?

খুব—সত্যি তুমি থাকবে আমার পাশে—পাশে.....বন বাদার পর্বতমালা আর ঝর্ণার ধারে ঘুরে বেড়াবো খুব করে। মনির তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

উঁ হুঁ!

কারণ?

কারণ বনবাদার পর্বতমালা আর ঝর্ণা আমার অতি পরিচিত। নতুন কিছু হলে আনন্দ পেতাম। তাছাড়া আমি সাহিত্যিক বা কবি নই যে প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার মনে রং ধরাবে।

মনির তুমি মাঝে মাঝে বড্ড নীরস কথা বলো। যা শুনলে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

নীলা তুমি সুখীজন তাই সত্য তোমার কাছে নীরস লাগে।

মনির! অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে উঠে নীলা।

রংলাল ওর মুখখানা তুলে ধরে বলে—তুমি বড্ড অভিমানী নীলা।

আর তুমি?

অভিমান আমি জানিনা। বলো কোন দিন আমাকে দেখেছো মুখ গোমটা করে বসে থাকতে? কেউ মন্দ কথা বললেও আমি হাসি মুখে তা হজম করে নিয়েছি.....

খুব হয়েছে আর বলতে হবে না যাও নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও গে।

আমার আবার এমন কিইবা জিনিসপত্র আছে যা গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে।

তবু চলো আমি গুছিয়ে দেবো সব। বলে নীলা।

রংলাল ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠে—মাফ করুন আপামনি আমার জিনিস আপনার গুছিয়ে দিতে হবে না।

খিল খিল করে হেসে উঠে নীলা।

রংলাল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক চোখে। দিনটা কেটে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

কাল সকালে ফিরুগাঁও অভিমুখে রওয়ানা দিতে হবে।

আমির আলী সাহেবকে আজ অত্যন্ত বিমর্ষ ম্লান লাগছে।

আর কেউ না জানলেও রংলাল জানে কেনো আজ আমির আলী সাহেব এমন মন মরা হয়ে পড়েছেন। সমস্ত মুখ মণ্ডলে তার কালিমা পড়ে গেছে।

রাতে খাবার টেবিলে বসেও তেমন কোন কথাবার্তা তিনি বললেন না।

নীরবে খেয়ে উঠে পড়লেন তিনি।

পরদিন।

যাত্রার আয়োজন চলেছে।

বয় বাবুর্চি এবং রংলাল যাবে আমির আলী সাহেবের সঙ্গে। একজন দারওয়ানও যাবে কারণ সব সময় প্রহরী দরকার। জঙ্গলের জায়গা কখন কি বিপদ আপদ আসে কে জানে। তাই তিনি সব সময় সজাগ থাকেন।

পিছন আসনে আমির আলী সাহেব আর নীলা বসলো।

ড্রাইভিং করে চললো রংলাল নিজে।

দ্বিতীয় গাড়িতে বয় বাবুর্চি আর দারওয়ান এবং প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র।

গাড়ি দুখানা স্পীডে ছুটে চলেছে।

শহরের পথ ছেড়ে এবার গ্রাম্য পথ। তারপর নির্জন প্রান্তর।

উপরে নীল আকাশ।

সম্মুখে প্রশস্ত পথ, শুধু কোমল ঘাস আর পাথরের টিলা। গাড়ি দু'খানা এবার হোচট খেয়ে খেয়ে এগিয়ে চললো।

মাঝে মাঝে ঝর্ণা ধারা বয়ে চলেছে।

খান বাহাদুর আমির আলী সাহেবের গাড়ি দু'খানা যখন ফিরুগাঁও এর সীমানায় প্রবেশ করলো তখন কান্দাই পর্বত মালার উচ্চস্থানে একটি গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছিলো হামবার্ট।

গাড়ি দু'খানা কি ভাবে এগুচ্ছে এবং গাড়ি দু'খানার মধ্যে কে কি ভাবে বসে রয়েছে সব সে লক্ষ্য করছিলো তীক্ষ্ণ নজরে।

তার দু'পাশে দু'জন অনুচর দাঁড়িয়েছিলো।

তারাও লক্ষ্য করছে সব কিছু।

একজন বলে উঠলো—মালিক নীলার সঙ্গিটি তাদের সঙ্গেই আসছে।

হামবার্ট দাঁতে দাঁত পিষে বললো—কোন ব্যক্তি সেই নরাধম।

দ্বিতীয় জন বললো—প্রথম গাড়িখানাই যে ড্রাইভ করে আসছে।

হামবার্ট পূর্বের মতই কঠিন কণ্ঠে বলে—মৃত্যুর আহ্বানে সে ছুটে এসেছে। এবার কে ওকে রক্ষা করে দেখা যাবে।

মালিক ওরা বাংলার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। বললো প্রথম সহকারী।

দ্বিতীয় জন বললো—প্রথম গাড়িখানা বাংলোর ফটকে প্রবেশ করেছে মালিক।

হাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি। যাও তোমরা জঙ্গল বাড়ি ঘাটির একনম্বর গুহায় আমার অবস্থানের ব্যবস্থা করবে। আমি এই গুহায় খান বাহাদুর এবং

তার কন্যা নীলার সঙ্গে মিলিত হবো। কথাগুলো বলে হামবার্ট পর্বত মালার সুউচ্চ শৃঙ্গ থেকে নেমে গেলো।

পর্বতের পাথরে হামবার্টে'র বুটের শব্দ শোনা গেলো খট্ খট্ খট্...

রাত বেড়ে আসছে।

আমির আলী সাহেব কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছেন।

নীলার মধ্যে কিন্তু কোন পরিবর্তন আসেনি সে খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠেছে।

পাশের কামরায় রংলালের শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর রংলাল চলে গেছে তার নিজের কামরায়।

নীলা নিজের কক্ষে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলো।

এমন সময় রংলাল এসে দাঁড়ায়—নীলা চাচা চাচীকে দেখবার বড্ড সখ হয়েছে রাতের মত বিদায় চাই?

নীলা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়—এই এতো রাতে তুমি বাংলোর বাইরে যাবে মনির?

হাঁ নীলা।

তা হয়না, জঙ্গলের যায়গা বিপদ আসতে পারে।

হাসে রংলাল—বিপদ! বিপদ যদি আসে তাতে ভয় পাবার কিছু নাই নীলা।

না আমি তোমায় যেতে দেবোনা মনির। দু'হাতে নীলা ওর জামার কলার চেপে ধরে।

রংলাল বলে—তা হলে কাল সকালে আমায় যেতে হবে। তুমি বলেছিলে না সকালে কান্দাই পর্বত মালার পাদ মূলে বেড়াতে যাবে?

হাঁ।

তা হলে যেতে দাও।

বেশ যাও কিন্তু ভোর হবার আগে চলে এসো কিন্তু।

নিশ্চয়ই আসবো।

আব্বুকে বলবেনা?

বলবো। তাঁকে না বলে যাবো, তা হয়না।

আচ্ছা যাও।

রংলাল স্থির নয়নে তাকিয়ে থাকে নীলার মুখের দিকে।

নীলা হেসে বলে—কি দেখছো মনির?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে রংলাল—কিছু না। তারপর বেরিয়ে যায় নীলার কক্ষ থেকে।

খান বাহাদুর সাহেব তার কক্ষ মধ্যে পায়চারী করে চলেছেন, চোখে মুখে তার উদ্বিগ্নতার ছাপ।

রংলাল দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে ডাকে—মালিক।

খান বাহাদুর আমির আলী যেন আচমকা চমকে উঠলেন। —কে রংলাল?

হাঁ মালিক।

তুমি এতো রাতে, কি চাও!

মাথা চুলকে বলে রংলাল—মালিক চাচা চাচীকে এক নজর দেখতে যাবো। কাল সকালে সময় পাবো না তাই...

একটু ভেবে বললেন আমির আলী সাহেব—বেশ যাও!

কথাটা বলে তিনি পুনরায় পায়চারী করতে শুরু করলেন। রংলাল বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

খাবার সময় সবার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলো রংলাল। দারওয়ান বাবুর্চি বয় সবাইকে সে বললো—চাচা চাচীকে দেখতে যাচ্ছি।

এতো রাতে বাংলোর বাইরে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয় বললো ওরা।

কিন্তু রংলাল কারো নিষেধ শুনলো না। সে হাসি মুখে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

ক্রমেই রাত বাড়ছে।

বাংলোর দেয়াল ঘড়ি রাত একটা ঘোষণা করলো।

তারপর রাত দু'টো।

রাত তিনটা।

আমির আলী সাহেব বারবার দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। চোখে মুখে তার একটা দারুন উৎকণ্ঠার ভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

এমন সময় একটা গাড়ি ডাক বাংলোর সম্মুখে এসে থামলো।

গাড়ি থেকে নামলো দু'জন অদ্ভুত পোশাক পরা লোক। তারা এগিয়ে চললো বাংলো অভিমুখে। আমির আলীর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে দু'জন দাঁড়ালো তার দু'পাশে।

আমির আলী সাহেব প্রথমে হতভম্ভ হলেও পরক্ষণে নিজকে সামলে নিলো কিন্তু কোন কথা বললেন না।

লোক দু'জনের একজন বললো—চলুন আমরা আপনাকে নিতে এসেছি।

অপরজন বললো—নীলা সহ চলুন।

আমির আলী সাহেব ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন, মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে। কোন জবাব তিনি দিলেন না।

লোক দু'জনের প্রথম জন আবার বললো—এই দন্ডে রওয়ানা না দিলে আমরা আপনাকে জোরপূর্বক নিয়ে যাবো।

জোরপূর্বক নিতে হবে না আমি অমনিই যাচ্ছি কিন্তু নীলাকে সংগে নিবোনা। কথাগুলো গম্ভীর এবং দৃঢ় গলায় বললেন আমির আলী সাহেব।

লোক দুটির দ্বিতীয় জন বললো—নীলাকে না নিয়ে আমরা যাবোনা খান বাহাদুর। মালিকের আদেশ অমান্য করা আমাদের সাধ্য নয়। বলুন যাবেন কিনা?

অপরজনও বলে উঠলো—বলুন যাবেন কিনা?

না।

সত্যি বলছেন?

হাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন দু'পাশ থেকে ধরে ফেলে খান বাহাদুর আমির আলীকে। লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে ফেলে তাকে। তারপর টেনে নিয়ে চলে পাশের ঘরের দিকে।

নীলার ঘুম ভেংগে যায় ধড়মড় করে বিছানায় উঠে। বসেই তার চক্ষু স্থির দেখতে পায় তার আব্বুকে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন নর শয়তানের মত ভয়ঙ্কর লোক।

নীলা আরষ্ট হয়ে গেছে যেন কিছু বলতে পারে না দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

লোক দু'জন এবার নীলাকে ধরতে যায়।

নীলা বলে উঠে—খবরদার আমাকে স্পর্শ করোনা। বলো কে তোমরা? আমার আব্বুকে অমন করে বেঁধেছো কেনো?

সব জানতে পারবে নীলা। বললো একজন লোক।

অপরজন বললো—তোমার আব্বু তোমাকে বিক্রি করে দিয়েছে।

আমির আলী সাহেব চিৎকার করে উঠেন—মিথ্যা কথা। সব মিথ্যা কথা——

ততক্ষণে ওরা দু'জন নীলাকে ধরে ফেলেছে। তুলে নিলো ওরা ওকে হাতের উপর।

নীলা হাত পা ছুড়ে চিৎকার করে ওদের কবল থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সে একটি তরুণী দু'জন বলিষ্ঠ পুরুষের সংগে পেরে উঠা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

নীলাকে ওরা গাড়িতে তুলে নিলো।

পাশের আসনে খান বাহাদুর আমির আলীকে লৌহ শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় বসিয়ে নিলো ওরা।

গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

অদ্ভুত গাড়ি উঁচু নীচু টিলা পথে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চললো। ঝোপ ঝাড় আগাছা কিছু বাধলোনা। গাড়ির সম্মুখে।

গাড়ির হেড লাইট দুটো অন্ধকারে অজগরের চোখের মত দেখাচ্ছে। লাইটের উপরিভাগ কালো আবরণে ঢাকা থাকায় আলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছেনা।

স্পীডে চলেছে গাড়িখানা।

গাড়ির মধ্যে নীলার মুখে রুমাল বাধা থাকায় সে কোন রকম চিৎকার করতে পারছেনা। হাত দু'খানাও তার পিছ মোড়া করে বাঁধা।

আমির আলী সাহেব অসহায় বেচারীর মত কাৎ হয়ে পড়ে আছেন পিছন আসনে। তার মুখেও ওরা রুমাল বেঁধে নিয়েছে।

ঘন্টা দুই চলার পর কান্দাই পর্বত মালার পাদদেশে এসে গাড়ি খানা থেমে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো লোক দু'জন। তারপর নীলাকে একজন তুলে নিলো কাঁধে।

খান বাহাদুর সাহেবকে একজন ধরে টেনে নামিয়ে নিলো নিচে। তারপর জোর পূর্বক নিয়ে চললো তাঁকে।

নীলার হাত দু'খানা বাধা থাকায় সে কোনরকম নড়া চড়া করতে পারছেনা! পা দু'খানা ছুড়তে লাগলো শুধু।

পর্বতমালার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে একটা সুড়ঙ্গ পথ। নীলা এবং আমির আলী সাহেবকে নিয়ে সেই সুড়ঙ্গ পথে লোক দু'জন এগিয়ে চললো।

কিছুটা এগুতেই গভীর গর্ত নজরে পড়লো।

পাশেই একটি লিফট্।

লোক দু'জন আমির আলী এবং নীলাকে নিয়ে লিফ্টার উপরে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে লিফট্টা গর্তটার মধ্যে নেমে চললো।

চারিদিকে শুধু জমাট অন্ধকার।

কিছুক্ষণ ধরে লিফট নামলো। হঠাৎ একটা উজ্জল আলো নজরে পড়লো তাদের।

লিফট্ থেমে গেছে।

এবার লোক দু'জন আমির আলী ও নীলা সহ লিফট্ থেকে নেমে পড়লো।

আবার সুড়ঙ্গ পথ।

উজ্জল আলোটা সুড়ঙ্গ পথের মুখেই জ্বলছিলো।

আবার অন্ধকার।

নীলাকে কাঁদে করে এগিয়ে চলেছে প্রথম লোকটি।

দ্বিতীয় লোকটি আমির আলীকে টেনে হিঁছড়ে নিয়ে চলেছে। বার বার তিনি হোচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন তবু পুনরায় উঠে আবার চলছেন।

নিরুপায় অসহায় তিনি এই মুহূর্তে তার কোন উপায় নাই নিজকে রক্ষা করে বা নীলাকে উদ্ধার করেন তিনি।

নীলা তাকিয়ে দেখে অন্ধকারে তাকে নিয়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে পিতার যন্ত্রণাময় আর্তকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। নিলা বুঝতে পারে এই সেই জঙ্গল বাড়ি ঘাটি।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর একটা বিরাট গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো লোক দু'জন আমির আলী সাহেব ও নীলা সহ।

জমাট অন্ধকার থেকে আলোর বন্যায় প্রথমে চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেলো যেন। নীলাকে নামিয়ে দিলো লোকটা কাঁধ থেকে নিচে।

আমির আলী সাহেবকেও এনে দাঁড় করানো হলো।

সংগে সংগে একটা গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর—খান বাহাদুর।

নীলা সম্মুখে চোখ দুটো তুলে ধরলো অমনি তার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো যেন। সে দেখতে পেলো একটি জীবন্ত শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা তাদের দিকে তাকিয়ে কটমট করে হাসছে।

শিউরে উঠলো নীলা।

আমির আলী সাহেবের মুখের বন্ধন খুলে দেওয়া হলো। নীলার মুখের রুমাল খানাও খুলে দিলো ওরা।

আমির আলী সাহেব রীতিমত হাঁপাচ্ছেন।

নীলা একবার শয়তানগুলোর মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে পিতার দিকে তাকালো। অসহায় আমির আলীর মুখখানাকে বড় করুণ লাগছে।

গর্জে উঠলো শয়তান—খান বাহাদুর এখন নীলাকে আমার হাতে তুলে দিতে তোমার আপত্তি আছে?

আমির আলী সাহেব গর্জে উঠলেন—হামবার্ট যতক্ষণ আমি নীল পাথর হাতে না পাবো ততক্ষণ আমি নীলাকে তোমার হাতে তুলে দেবো না।

অট্টহাসিতে ভেংগে পড়লো হামবার্ট তারপর বললো—নীল পাথর দেবো তারপর তুমি নীলাকে আমার হাতে তুলে দেবে কিন্তু তোমাকে যদি হত্যা করি তা হলে তুমি বাধা দিতে পারবে?

আমির আলী নীরব।

এখন তোমার জীবন আমার হাতের মুঠায়, কাজেই তুমি যদি জীবনে বাঁচতে চাও তাহলে নীলাকে বিনা দ্বিধায় আমার হাতে সমর্পণ করো। নচেৎ মৃত্যু তোমার অনিবার্য...

মরতে আমার ভয় নেই হামবার্ট——

তা জানি কিন্তু নীলাকে দিতে তোমার এতো দ্বিধা কেনো? নীলা তোমার কন্যা নয় তবু তুমি তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাও কেনো?

নীলা স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো, এক্ষণে তার মনে পড়ে রংলালের কথা সে বলেছিলো খান বাহাদুর আমির আলী তার পিতা নয়। কথাটা সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেও মনে প্রাণে সে কথাটাকে গ্রহণ করতে পারেনি। আজ শয়তান হামবার্টের মুখে ঐ উক্তিটা তাকে ভাবিয়ে তুললো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো নীলা খান বাহাদুর আমির আলীর মুখের দিকে।

আমির আলী বললেন—নীলা আমার কন্যা না হলেও আমি তাকে আপন কন্যার মত স্নেহ করি। তা ছাড়া নীলাও জানে আমি তার পিতা। কিন্তু আমার জীবন গেলেও আমি তাকে তোমার হাতে তুলে দেবোনা।

কারণ? বললো হামবার্ট।

কারণ ডাঃ রায় নীলাসহ নীল পাথর আমায় দিয়েছিলেন তুমি সে নীল পাথর নিয়েছো।

কিন্তু আমি তোমায় কোটি কোটি টাকা দিয়েছি তুমি কথাও দিয়েছিলে নীলাকে দেবে!

না আমি কথা দেইনি। আমি নীলাকে দেবো না একথা দেয়নি——

খান বাহাদুর কথা না দিলেও নীলাকে তোমার দিতে হবে নীলার বিনিময়ে তুমি পাবে তোমার জীবন আর তোমার ল্যাবরেটরি যা থেকে তুমি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করো।

না আমি কিছুতেই নীলাকে দেবোনা। দৃঢ় কণ্ঠস্বর খান বাহাদুরের।

আবার অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে হামবার্ট, হাসি থামিয়ে বলে—জমপুরিতে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে সাহস হয় খান বাহাদুরের।

এবার নীলা বলে উঠে—শয়তান আব্বুকে হত্যা করতে পারো কিন্তু মনে রেখো আমাকে তুমি পাবে না।

হাঃ হাঃ হাঃ নীলা তুমি হয়তো আমার নাম শুনেছো কিন্তু আমাকে তুমি দেখোনি তাই এমন কথা বলতে পারলে। বহুদিন থেকে আমি তোমার জন্য প্রতিক্ষা করছি। কারণ তুমি ছোট ছিলে আমিও তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম.....নীলা কেউ তোমাকে আমার এ জংগল বাড়ি ঘাটি থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। তোমাকে আমি চাই.... হামবার্ট দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এলো নীলার দিকে।

সেকি ভয়ঙ্কর মূর্তি নর পশুর।

দু'চোখে তার লালসাপূর্ণ চাহনী।

বললো আবার হামবার্ট—নীলা শুধু তোমার জন্য আমি শত শত ব্যক্তিকে হত্যা করেছি.....তুমি আমার হৃদয়ের রাণী...

নীলার দু'হাত পিছ মোড়া করে বাঁধা তবু সে পিছু হটছে।

খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব রাগে ক্ষেভে অধর দংশন করছেন। তাঁরও হাত দু'খখানা বাঁধা রয়েছে পিছ মোড়া করে।

হামবার্ট হাত দু'খানা প্রসারিত করে নীলাকে ধরে ফেলে।

নীলা চিৎকার করে উঠে—আব্বু আমাকে বাঁচাও...

ঐ মুহূর্তে একটা বজ্র কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা যায়—হামবার্ট নীলাকে মুক্ত করে দাও—

সংগে সংগে হামবার্ট নীলাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে তাকায়। গুহার মধ্যে সবাই চমকে উঠে তারাও ফিরে তাকায় পিছনে। দেখতে পায় অদূরে গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আছে জমকালো পোশাক পরা একটি ছায়ামূর্তি।

এক সংগে খান বাহাদুর আমির আলী এবং নীলা বলে উঠে—দস্যু বনহুর।

হামবার্ট অগ্নিমূর্তি ধারণ করে তাকিয়ে আছে ছায়ামূর্তির দিকে তার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসে—দস্যু বনহুর।

পরবর্তী বই

দস্যু বনহুর ও হামবার্ট